স্বস্তিকা

দাম : পাঁচ টাকা
৬ জুন, ২০১১, ২২ জ্যৈষ্ঠ - ১৪১৮
৬৩ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা

থামাও সন্ত্রাস

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ❑ ৬-৭

বামফ্রন্টের প্রতারণার শিকার প্রবীণ সাংবাদিকরাও ❑ ৮

টাটাদের জলের দরে ফলের রস দিয়েছিলেন বুদ্ধ-নিরুপম ❑ ৯

৩৪ বছরের বাম-শাসনের অবসান, রাহুমুক্তি ঘটল পশ্চিমবঙ্গে ❑ ১১

প্রজাদের মারলে তারাও ছেড়ে কথা বলবে না ❑ জয় দুবাসী ❑ ১৩

জেহাদী সন্ত্রাসের কারখানা পকিস্তান ❑ মেঃ জেঃ কে কে গাঙ্গুলী (অবঃ) ❑ ১৪

ভারত প্রত্যাঘাতের জন্য তৈরি না হলে বিপন্ন হবে দেশের অস্তিত্ব
❑ সাধন কুমার পাল ❑ ১৬

নিরীশ্বরবাদীদের নৃত্য আর হিন্দুর দুঃখের বৃত্ত ❑ শৌর্যধ্বজ সৌকালিন ঘোষ ❑ ১৯

'শিশু-কন্যাদের রক্ষা করো' দাবি উঠেছে মহারাষ্ট্রের গ্রামে ❑ ২১

হুগলী জেলার গোঘাটে কিছু অপরিচিত মন্দির-দেবালয় ❑ ডঃ প্রণব রায় ❑ ২৪

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ❑ চিরন্তন চক্রবর্তী ❑ ২৫

দশহরায় গঙ্গাবন্দনা ❑ নবকুমার ভট্টাচার্য ❑ ২৬

শতবর্ষের সরণি বেয়ে হাসিরাশি দেবী ❑ মিতা রায় ❑ ২৭

বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ ও গবেষক ডঃ প্রণব রায়কে সম্মান রাজ্যপালের ❑ ২৯

নির্বাচনী ফলাফল : ঈশান কোণে কালো মেঘ ❑ শিবাজী গুপ্ত ❑ ৩০

গীতুই অনুপ্রেরণা ভারতীয় নারীদের ❑ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ৩১

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

সন্ত্রাসস্থান পাকিস্তান — ১৪-১৬

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ১০ ❑ **অন্যরকম : ১৮** ❑ **চিঠিপত্র : ২২** ❑
জনমত : ২৩ ❑ **সমাবেশ-সমাচার : ২৮** ❑ **শব্দরূপ : ৩২** ❑ **চিত্রকথা : ৩৩**

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৩ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা, ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ৬ জুন - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

L. No.-MM & P.O. / SSRM-KOL.RMS
RNP-048/LPWP-028/2010-12

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail :
swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

সম্পাদকীয়

শিরোনামে 'সাচার'

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রাজিন্দর সাচার-এর স্থান এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে ইসলামপন্থীদের কাছে সম্ভবত ইসলাম ধর্মের প্রবর্তকের পরেই। কেননা, তিনি চোখে আঙুল দিয়া এদেশের অপবিত্র মাটিতে (না-পাক) ইসলাম অনুগামীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান সমীক্ষা করিয়া সবার সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। বলা বাহুল্য তাহার জন্য তিনি একা সেই কৃতিত্বের দাবী করিতে পারেন না—ইউপিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব মনমোহন সিংহকেও কুর্ণিশ না করাটা নিতান্তই অসৌজন্যের পরিচায়ক। একে তো তিনি 'সাচার কমিটি' গড়ার প্রধান কারিগর, দ্বিতীয়ত তিনি খুল্লমখুল্লা ঘোষণা করিতে কোনও কার্পণ্য করেন নাই যে, এদেশের সম্পদে প্রথম অধিকার মুসলমানদের। এতবড় 'হক কথা' ইতিপূর্বে কেহই কহিতে পারেন নাই। যতদূর খবর, মনমোহন সিংজী পাক-ভূমি হইতেই দেশভাগজনিত কারণে না-পাক ভারতে আসিয়াছিলেন। এহ বাহ্য। সাচার সাহেব মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক দুরবস্থার চিত্র তুলিয়া ধরিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি কেন্দ্র সরকারের নির্দেশ মতোই কতিপয় আশুব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাবও সুপারিশ করিয়াছেন। সেই সুপারিশ মতো রাজ্যে রাজ্যে এবং কেন্দ্রে বেশকিছু ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হইয়াছে এবং হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী তাহাতেই সন্তুষ্ট হন নাই। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনি সাচার সাহেবকে পশ্চিমবঙ্গে আসিবার জন্য আমন্ত্রণও জানাইয়াছেন। পরিবর্তনের প্লাবনে উচ্ছ্বসিত এবং উজ্জীবিত বঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়া শ্রী সাচার যে পশ্চিমবঙ্গে আসিবেন ইহা একরকম নিশ্চিত বলা যায়। তাঁহার পরামর্শমতো এবঙ্গের সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে অসংখ্য প্রস্তাব ও পরিকল্পনা গৃহীত হইতে চলিয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য। বেকুব আমজনতাকে বুঝিতে হইবে ইহার পিছনে মূল উদ্দেশ্য কি? স্বাধীনতার ৬২ বৎসর পরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এই বোধোদয়ের কারণ কি তাহা অনুধাবন করিতে হইবে। জনৈক তৃণমূল নেতার একান্ত বক্তব্য—নেত্রীর রোজা, নামাজ, দোয়া, ইফতার-এর যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। তাহা হইল, পশ্চিমবঙ্গেও বিধানসভার অন্যূন ১২৫ আসনে সংখ্যালঘু ভোটই নাকি নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের নির্ধারণ ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবার কোনও অবকাশ নাই। মুসলমানদের দুরবস্থা দূরীকরণে নানা ব্যবস্থা গ্রহণে কোনও আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু যাহারা দুবেলা অন্ন জুটাইতে না পারিয়া পিপীলিকার ডিম খাইয়া জীবনধারণ করে, যাহারা শুধুমাত্র তথাকথিত হিন্দু ও উচ্চবর্ণজাত বলিয়া গরীব নিরন্ন হইয়াও সরকারী সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত, তাহাদের প্রতি কি সুবিচার হইতেছে? আর্থিক দুরবস্থা কি ধর্মমতকে অনুসরণ করিয়া আসে? যে পিতা সামান্য কাঠমিস্ত্রী— মেধাবী পুত্রকে শুধুমাত্র দারিদ্র্যের কারণে গুণাত্মক উচ্চশিক্ষা প্রদান করিতে পারিতেছেন না, তিনি কি হিন্দু সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া অপরাধ করিয়াছেন?

তবে মনমোহনের অন্তরাত্মার ভাষায় 'মৌত কা সওদাগর' মোদীর রাজ্যেই ভারতের মধ্যে সংখ্যালঘুদের অবস্থা সর্বাপেক্ষা উন্নত। সুতরাং সাচার মারফত এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একবার মোদীর গুজরাটের ব্যবস্থাদিতে চোখ বুলাইয়া লইতে পারেন। আশা করি তাহাতে সুফল ফলিতে পারে। এতাদৃশ দুঃসাহস 'আনন্দবাজার পত্রিকা' করিয়াছে। দিদির করিতে দোষ কি?

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আমরা কোনও নূতন কাজ করতে চাই না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেভাবে সমাজ ও সংস্কৃতির সেবা করেছিলেন, যে আদর্শ তাঁরা নিজেদের সামনে রেখেছিলেন এবং তার জন্য দিনরাত চেষ্টা করেছিলেন সেই আদর্শ অনুসরণকারী বহু লোক যদি কোথাও একত্রিত হয় তবে সেখানে এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে যা সংগঠনের পক্ষে অনুকূল। সমস্ত দেশে এইরূপ পবিত্র, শ্রদ্ধাপূর্ণ, ধ্যেয়নিষ্ঠ আদর্শে অনুপ্রাণিত, উৎসাহপ্রদ এবং নির্ভরশীল পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

—ডাক্তার কেশববলিরাম হেডগেওয়ার

জনগণকে বোকা বানাতে

ফাঁসির আসামীদের জীবন-ভিক্ষায় কেন্দ্রের দু'মুখো নীতি

দ্বিবেন্দর পাল সিং ভুল্লার— প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজ করেছেন রাষ্ট্রপতি।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ২৬ মে দ্বিবেন্দর পাল সিং ভুল্লার এবং মহেন্দ্র নাথ দাসের জীবন-ভিক্ষার আবেদন খারিজ করে দিলেন দেশের রাষ্ট্রপতি প্রতিভা দেবী সিং পাতিল। এবং এর পরিপ্রেক্ষিতেই সপ্তাহভর রাজধানীতে জল্পনা চলছে জীবন-ভিক্ষা'র ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার দু'মুখো নীতি কেন নিচ্ছে? প্রসঙ্গত, 'তোল এবং বাছো' (পিক অ্যান্ড চুজ) পদ্ধতিতে ওই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত দুই আসামীর ভাগ্য নির্ধারণ করেন রাষ্ট্রপতি। দিল্লী কংগ্রেসের প্রাক্তন যুব সভাপতি এম এস বিট্টা এবং পাঞ্জাব পুলিশের প্রাক্তন বড়কর্তা এস এস সাইনি'র বিরুদ্ধে বোমা বিস্ফোরণের মূল পাণ্ডা ভুল্লারকে ২০০২-এর ডিসেম্বরে মৃত্যুদণ্ড দেয় সুপ্রিম কোর্ট। রাষ্ট্রপতির কাছে ২০০৩-এর ১৪ জানুয়ারি প্রাণভিক্ষার আবেদন জানায় ভুল্লার। গত ২৩ মে সুপ্রিম কোর্ট দিল্লী সরকারের কাছে সাড়ে ৮ বছর ধরে ভুল্লারের ফাঁসির আদেশ কার্যকর না করার ব্যাখ্যা চায়। তার পরিপ্রেক্ষিতেই কেন্দ্রের বকলমে রাষ্ট্রপতির এহেন সিদ্ধান্ত। ২০০৫-এর ৯ আগস্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবিষয়ে চূড়ান্ত সুপারিশ করে। অপর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত আসামী মহেন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুদণ্ড দেয় সুপ্রিম কোর্ট গত ১৪ মে, ১৯৯৯-এ। তার অপরাধ ছিল গুয়াহাটি শহরের বুকে দিন-দুপুরে এক ব্যক্তির মাথা কেটে সেই কাটা মাথাটি স্থানীয় থানায় পাঠিয়ে দেওয়া। ভুল্লারের মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে চূড়ান্ত সুপারিশ করার দু' মাসের মধ্যেই ২০০৫ সালের ২১ জুন রাজীব হত্যা মামলায় তিন আসামী মুরুগান, সানথান এবং আরিভু'র মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রেও একইভাবে চূড়ান্ত অনুমতি দিয়েছিল। ২০০০ সাল থেকেই ঝুলে রয়েছে এদের মামলাটি। ওই বছরই যখন রাজীব হত্যায় অভিযুক্ত ওই তিন ব্যক্তি ক্ষমা ভিক্ষা চান, তখনই মহেন্দ্রনাথ দাস তার মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আবেদন জানায়। ২০০৫-এর ১০ এপ্রিল কেন্দ্রীয় সরকার দাসের মৃত্যুদণ্ডের জন্য চূড়ান্ত সুপারিশ করে।

অথচ আফজল গুরুর ফাঁসি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই টালবাহানা করছে কেন্দ্র। ২০০৬-এর অক্টোবরে পার্লামেন্ট আক্রমণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত

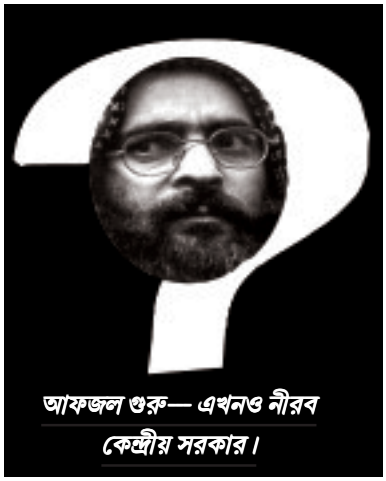

আফজল গুরু— এখনও নীরব কেন্দ্রীয় সরকার।

আফজল গুরুর ফাঁসির আদেশ দেওয়া হলেও সে বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়ার কোনও নাম-গন্ধ নেই সরকারি তরফে। এই বছরের ফেব্রুয়ারিতেই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেনে নিয়েছেন, '২০০৯-এর মে থেকে (ওই সময়ই তিনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব গ্রহণ করেন) আমি রাষ্ট্রপতির কাছে ১৩টি মামলা (ফাঁসির) জমা দিয়েছি এবং এর মধ্যে সাতটি মামলার সিদ্ধান্ত ঘোষণা হতে চলেছে।' কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, কোর্ট চত্বরে বোমা বিস্ফোরণের জন্য '৯৯-এ সুপ্রিম কোর্টে ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত আসামী শেখ মীরনসহ আরও দু'জনের ব্যাপারে ২০০৫-এর আগস্টে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের চূড়ান্ত অনুমোদনের পরও ফাঁসির সিদ্ধান্ত নিতে এত টালবাহানা করছেন কেন রাষ্ট্রপতি? একথা সকলেই জানে জীবন-ভিক্ষার ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত মুকুব ঘোষণাটাই রাষ্ট্রপতি খালি করেন, এনিয়ে সিদ্ধান্ত যা নেবার তা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাই নেয়। উত্তর-প্রদেশে বহু মানুষকে খুন করার অভিযোগে সুপ্রিম কোর্ট ২০০১ সালে মৃত্যুদণ্ড দেয় সুরেশ ও রামজি-র। এব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ২০০৫-এর জুনে অনুমোদন দেয়। এখনও এনিয়ে রাষ্ট্রপতির নীরবতা বহু সন্দেহের জন্ম দিচ্ছে।

এরকম বহু আসামী'র প্রাণভিক্ষার ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে প্রথম ইউ পি এ সরকার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার সূচনা লগ্নেই তাদের সম্বন্ধে চূড়ান্ত অনুমোদন রাষ্ট্রপতি'র কাছে পাঠিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের মাঝপথে সে ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি নীরব। বরং ভুল্লার বা দাসের মতো কিছু বিক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত সরকারের দ্বিচারিতাকেই প্রকট করছে। কারণ আফজল গুরুর মতো দেশদ্রোহীদের ব্যাপারে কেন্দ্র নজিরবিহীন টালবাহানা করে কয়েকটি পেটি কেসের অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ।

আজমল কাসভের ক্ষেত্রেও যে কেন্দ্র ভবিষ্যতে তার এই দু'মুখো নীতি বদলাবে এমন কোনও আভাস এখনও পর্যন্ত মিলছে না। আফজল কিংবা কাসভ—দু'জনকে নিয়েই কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে দেশবাসীকে ধোঁকা দিচ্ছে তাতে যে ভবিষ্যতে পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদীরাই উদ্বুদ্ধ হবে নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে।

আই এস আইয়ের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিচ্ছে পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যদি ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে ভারত নিউইয়র্কের আদালতে পাকপন্থী লস্কর-এ-তৈবা এবং আই এস আই-এর জঙ্গি তাহাউর রানা এবং ডেভিড কোলম্যান হ্যাডলির বিরুদ্ধে চলতি মামলায় আমেরিকার সঙ্গে একই 'পক্ষ' হতে পারে। একথা বলেছেন স্বরাষ্ট্রসচিব জি কে পিল্লাই। প্রসঙ্গত, এই হ্যাডলি পাকিস্তানের মূল নিবাসী এবং আমেরিকান মুসলমান। পুণের জার্মান

হেডলি

জি কে পিল্লাই

বেকারী এবং মুম্বাইয়ে ২৬/১১ হামলার আগেই মুম্বাইসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানের ভিডিও তুলে নিয়ে গিয়ে জঙ্গিদের আক্রমণের কাজটা সহজ করে দিয়েছিল।

শ্রী পিল্লাই আরও জানিয়েছেন, হ্যাডলির জবানবন্দীর ফলে তাহাউর রানার অপরাধ প্রমাণ হবেই। সেক্ষেত্রে হ্যাডলির আই এস আই-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের দাবী প্রতিষ্ঠিত হবেই।

এখানে উল্লেখ্য, গত বছরের নভেম্বর মাসে লস্কর জঙ্গিদের হাতে নিহত রভি গ্রাভ্রিয়েল হলফ্‌বার্গ এবং রিভকা'র আত্মীয়রা আদালতে মামলা করে। ২০০৮-এর নভেম্বরে লস্কর-এর বন্দুকবাজদের হাতে চাবাদ হাউস হত্যাকাণ্ডে ১৬৬ জন মানুষ মারা যায়। তাদের মধ্যে ৬ জন আমেরিকান। মামলায় পাক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই এবং আই এস আই-এর মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন লস্কর-এ তৈবাকে মদতদানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। ডেভিড কোলম্যান হ্যাডলি আমেরিকান হলেও মূলত পাকিস্তানী এবং পাক প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানির দূর সম্পর্কের আত্মীয়। গিলানী স্বয়ং হ্যাডলির বাবার শেষকৃত্যে যোগ দিয়েছিলেন বলে হ্যাডলি নিজেই জানিয়েছেন। এদিকে শ্রী পিল্লাই আমেরিকার দ্বিচারিতার বিরুদ্ধেও সরব। তিনি বলেছেন, 'পাকিস্তান হলো আমেরিকার মিত্র দেশ। অথচ আমেরিকাই আবার সেই বন্ধুর বিরুদ্ধে মামলা চালাচ্ছে।' এদিকে নিউইয়র্কের আদালত বলছে—আই এস আই নিজের উদ্দেশ্যপূর্তির জন্য লস্কর এ তৈবা'র মতো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে আসছে। একই কারণে আই এস আই লস্কর এবং অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনকে বস্তুগত সাহায্য দিচ্ছে। ওই আদালতে দাঁড়িয়েই হ্যাডলি ২৬/১১ মুম্বাই হামলায় পাক-গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই-এর জড়িত থাকার কথা কবুল করে। এক্ষণে ভারত আই এস আই-এর এই ষড়যন্ত্রের মুখোশ খুলে দিতে চাইছে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সন্ত্রাসবাদকে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য পাকিস্তানের নিন্দা করেছেন।

অবশেষে ধৃত মালদার লাদেন

সংবাদদাতা : মালদা॥ বিশ্বত্রাস লাদেন নিহত হওয়ার পর এবারে মালদা ও দুই দিনাজপুরের ত্রাস আর এক লাদেন অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। ১৫ মে রাতে মালদা শহরের জয় লজ (হোটেল) থেকে দীর্ঘদিনের ফেরার এই লাদেন ধরা পড়ে। অনেকদিন থেকে ইংলিশবাজার ও দুই দিনাজপুরের পুলিশ জাল পেতেছিল তাকে ধরার জন্য। তিন জেলার থানাতে এই লাদেনের ছবি ঝোলানো ছিল এবং তাকে ধরলে পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল। ওইদিন লাদেন মালদা শহরে বড়সড় ডাকাতি করার ছক কষেছিল। কিন্তু তার আগেই সে ধরা পড়ল। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১৫ হাজার টাকার জাল নোট, ইউ এস এ নির্মিত একটি অত্যাধুনিক ৭.৫ এম এম পিস্তলসহ ৬টি কার্তুজ। জানা গেছে ওই দুষ্কৃতী মালদা জেলাসহ দুই দিনাজপুরে একের পর এক ডাকাতি, খুন-জখম, জাল নোট ও বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের কাজে যুক্ত ছিল। যোগাযোগ রয়েছে বাংলাদেশের উগ্রপন্থী সংগঠনের সঙ্গেও। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজলেও এতদিন তাকে ধরা যায়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃতের আসল নাম কানা মৌলবি। কিন্তু এই কানা মৌলবি বিভিন্ন সময়ে আনারুল শেখ, কোনও সময়ে হারসারুল হক নামে ছদ্মনামে কোনও জায়গাতে থাকত। আরও জানা গেছে এই লাদেনের তিনটি বড় বাড়ি রয়েছে। একটি রয়েছে পুরাতন মালদার যাত্রাডাঙাতে, একটি উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের কাপাসিয়া গ্রামে এবং আর একটি বাড়ি রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের সাহেবঘাটায়। আরও জানা গেছে, কানা মৌলবির অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ ছিল এবং তাকে যাত্রাডাঙা গ্রামের মানুষ জোট বেঁধে গ্রাম ছাড়া করেছিল। সম্প্রতি উত্তর দিনাজপুরের টুঙ্গিদিঘীর একটি মোটরসাইকেল শো-রুম থেকে এই কানা মৌলবি ওরফে লাদেনের নেতৃত্বে ৯টি মোটরসাইকেল ও একটি টাটা ৪০৭ গাড়ি নিয়ে পালায় এবং বাইকগুলি পাচার করে বাংলাদেশে। তাছাড়া সীমান্তের ওপার থেকে বিপুল পরিমাণ জাল নোট ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এদেশের বিভিন্ন রাজ্যে পাচারের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল সে। মালদা জেলা পুলিশ সুপার ভুবন মণ্ডল জানান, এই দুষ্কৃতী জাল নোট ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ ধরা পড়ায় মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ধৃতকে আদালতে তুললে তার জামিন নাকচ হয়ে যায়।

বামফ্রন্টের প্রতারণার শিকার প্রবীণ সাংবাদিকরাও

গূঢ়পুরুষের
কলম

বিগত বামফ্রন্ট সরকার যে রাজ্যবাসীকে স্রেফ ধাপ্পা এবং ফেরেববাজি চালিয়ে সপ্তম বা শেষ দফায় পশ্চিমবঙ্গে রাজপাট চালিয়েছিল তার একাধিক নমুনা ইতিমধ্যেই সংবাদমাধ্যম প্রকাশ করেছে। বামফ্রন্ট তথা সিপিএমের নির্বাচনী ইস্তাহারে যখন আরও বেশি সংখ্যায় রাজ্যের বিপিএল তালিকাভুক্ত মানুষকে দুই টাকা দরে চাল সরবরাহের গালভরা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তখন আলিমুদ্দিনের দয়াবানরা জানেন যে গত নভেম্বর মাস থেকেই বি পি এল কার্ডের চাল

বাম সরকারের প্রতারণার নানা নজির এখন সকলেরই জানা। কিন্তু যে কথাটা অনেকেই জানেন না তা হলো রাজ্যের চৌকস চালাক চতুর সাংবাদিকরাও সিপিএম তথা বাম সরকারের নির্বাচনী প্রতারণার শিকার হয়েছেন। লজ্জায়, আত্মগ্লানিতে প্রতারিত সাংবাদিকরা সেই খবরটি পাঁচকান করেননি। আত্মঅপমানের কথা কে ঢাক পিটিয়ে প্রচার করে?

টাকার অভাবে সরকার কিনতে পারছে না। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ অন্য খাতে রাজ্য সরকার খরচ করে ফেলেছে। এবং তা নিয়ম নীতি আইন কোনও কিছুই না মেনে। শুধু দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের পেটের ভাতই নয়, দরিদ্র বিধবার প্রাপ্য সামান্য ভাতা অথবা বার্ধক্যভাতা সবই গত ছয় সাত মাস বামফ্রন্ট সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপরেও বিমান বসু, বুদ্ধদেবরা দলীয় প্রচারপত্রে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। কোনওভাবে রাজ্যবাসীকে তাঁরা জানতে দেননি যে গত নভেম্বর মাসেই রাজ্যের সমস্ত ট্রেজারীকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে একমাত্র সরকারী কর্মীদের বেতন ও পেনশন ছাড়া অন্যান্য সমস্ত খাতের ব্যয় বরাদ্দের টাকা না দিতে।

বাম সরকারের প্রতারণার নানা নজির এখন সকলেরই জানা। কিন্তু যে কথাটা অনেকেই জানেন না তা হলো রাজ্যের চৌকস চালাক চতুর সাংবাদিকরাও সিপিএম তথা বাম সরকারের নির্বাচনী প্রতারণার শিকার হয়েছেন। লজ্জায়, আত্মগ্লানিতে প্রতারিত সাংবাদিকরা সেই খবরটি পাঁচকান করেননি। আত্মঅপমানের কথা কে ঢাক পিটিয়ে প্রচার করে? ঘটনাটি এই রকম। কলকাতা প্রেসক্লাব গত দুই তিন বছর ধরেই দাবি জানাচ্ছিল যে বৃদ্ধ অশক্ত সমাজকর্মী, লেখক, নাট্যকর্মী, অত্যাচারিত রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য রাজ্য সরকার যে পেনশন চালু করেছে সেই তালিকায় অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ সাংবাদিকদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হোক। প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধিও রাজ্যের সাংবাদিকদের এই দাবিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু বুদ্ধবাবুরা তখন রাজ্যপালকেই তাঁদের রাজনৈতিক শত্রু বলে চিহ্নিত করেছেন। ফলে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এরপরেই হঠাৎ পট পরিবর্তন। বিধানসভার নির্বাচন এসে পড়ে। সংবাদমাধ্যমকে হাত করতে আলিমুদ্দিনের কয়েকজন কৌশলবাজ সিপিএম নেতার পরামর্শে মহাকরণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রাক্তন বিশেষ সচিব নিলয় ঘোষ, প্রাক্তন চিফ অব নিউজ ব্যুরো মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তথ্য প্রতিমন্ত্রী সৌমেন্দ্রনাথ (অঞ্জন) বেরা কলকাতা প্রেসক্লাবকে সামনে রেখে শুরু করেন প্রতারণার ফাঁদ পাতা। পরে আলিমুদ্দিনের বড়কর্তাদের নির্দেশে প্রতারক চক্রে যোগ দেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অসীম দাসগুপ্ত। অসীমবাবুকে প্রয়োজন ছিল ফাঁদটিকে বিশ্বাসযোগ্য করতে। প্রেসক্লাবে রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করে অসীমবাবু ঘোষণা করেন রাজ্য সরকার অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ সাংবাদিক এবং চিত্র সাংবাদিকদের মাসিক দুই হাজার টাকা সাম্মানিক ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দেশের মোট ১১টি রাজ্যে এই জাতীয় সাম্মানিক ভাতা প্রবীণ সাংবাদিকদের ও সমাজকর্মীদের দেওয়া হয়। এরপরেই গত অক্টোবর মাসের ১৩ তারিখে প্রথম সরকারি বিজ্ঞপ্তি (নং-২৭২৫/আই সি এ) প্রকাশ করে অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ সাংবাদিকদের মাসিক দুই হাজার টাকা ভাতা বা পেনশন দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। বলা হয়, সরকারি পরিচয়পত্র ছিল এমন অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকরাই এই পেনশন পাবেন। তবে এর জন্য সরকার নির্দ্ধারিত ফর্মেই পেনশন পেতে ইচ্ছুক সাংবাদিকদের বিভিন্ন শর্ত মেনে আবেদন জানাতে হবে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর আরও দুইবার তার সংশোধন হয়। মোট ৫৬ জন প্রবীণ সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিক আবেদনপত্র জমা দেন। এরপরেই খেলা শুরু হয়। অসীমবাবু মহাকরণে সাংবাদিকদের জানান এই খাতে তিনি প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করে দিয়েছেন। সম্পূর্ণ অসত্য কথা। কোনও অর্থ বরাদ্দই হয়নি। উল্টে ট্রেজারী অফিসারদের গোপনে বলে দেওয়া হয় এই খাতে কোনও টাকা না দিতে। পুরো বিষয়টি একটি কলঙ্কজনক প্রতারণা। দুর্ভাগ্য, প্রেসক্লাব পরিচালকরা কিছুটা অজান্তেই বাম সরকারের ধাপ্পার শিকার হয়েছেন। তাঁদের শিখণ্ডী খাড়া করে অসীম দাসগুপ্ত, অঞ্জন বেরারা অনর্থক বৃদ্ধ অশক্ত সাংবাদিকদের অসহায়তার অন্যায় সুযোগ নিয়েছেন। রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও এই প্রতারণার ঘটনা অজানা নেই। তিনি মহাকরণে সাংবাদিকদের বলেছেন, ''যখন সিপিএমের সরকার এই ঘোষণা করেছিল তখনই আমি বলেছিলাম এটা প্রকাণ্ড ধাপ্পা। ওদের যদি সদিচ্ছা থাকতো তবে অনেক আগেই এই কাজটি করতে পারতো। করেনি। যখন নির্বাচন এসে গেছে, বুঝতে পেরেছে এবার আর ফিরবে না তাই সংবাদমাধ্যমকে হাত করার ধাপ্পাবাজি শুরু করেছে। আমি চেষ্টা করবো কীভাবে প্রবীণ সাংবাদিকদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া যায়।'' হ্যাঁ, অপমানিত প্রবীণ সাংবাদিকদের সকলেই স্বীকার করেছেন যে এতবড় প্রতারণা অতীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনও সরকারই করেনি।

টাটাদের জলের দরে ফলের রস দিয়েছিলেন বুদ্ধ-নিরুপম

নিশাকর সোম

রাজ্যের চূড়ান্ত নির্বাচনী বিপর্যয়ের পরেই সিপিএমের অভ্যন্তরে তীব্র দ্বন্দ্ব উপস্থিত। রেজ্জাক মোল্লার কথা ''প্রেসার কুকার-এ বাষ্প বেশি হলে মাঝে মাঝে ভোস করে ওঠে।'' অর্থাৎ রেজ্জাক মোল্লা রাজ্যের নির্বাচনী বিপর্যয় সম্পর্কে তাঁর চাঁচাছোলা ভাষায়, অবশ্য নাম না করেই বলেছেন,—''হেলে ধরতে পারে না কেউটে ধরতে চায়।'' আর একজন সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য—''ওটা নাটের গুরু। ও-যে হারবে পৃথিবীসুদ্ধু লোক জানতো।'' রেজ্জাক মোল্লা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও নিরুপম সেন-কে উপলক্ষ করে এই উক্তি করেছেন। এই উক্তির প্রাসঙ্গিকতা হলো সিঙ্গুর-এ টাটার সঙ্গে চুক্তি। টাটা-এর সঙ্গে রাজ্য সরকারের চুক্তি সম্পর্কে বেসরকারি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যে তথ্য বেরিয়েছে, তাকে দেখা যায় টাটা-কে প্রায় এক হাজার একর চারফসলী জমি প্রায় জলের দরে দেওয়া হয়েছে। এরপর আবার কোটি কোটি ঋণ। বিদ্যুৎ প্রায় বিনামূল্যে। অন্যান্য সব ঋণ ছাড় ইত্যাদি প্রচুর সুযোগ দেওয়া হয়েছে। টাটাদের জামাই-আদর করে যে সুযোগ-সুবিধা উপঢৌকন দেওয়া হয়েছিল তা যদি রাজ্যের বন্ধ-কলকারখানাকে দেওয়া হতো, তাহলেই রাজ্যের সমস্ত কলকারখানা খুলে রাজ্যে শিল্পোন্নয়নের সমস্যা মিটতো। প্রশ্ন হলো, কেন টাটাদের এই সুবিধা দেওয়া হল? অধিকন্তু অনুসারী শিল্পের জন্য যাঁদের জমি দেওয়া হয়েছিল তার সম্পূর্ণ তালিকা নেই। কেন? এরমধ্যে অন্য কোনও রহস্য-লেনদেন কি জড়িত? ফলে চাষীর জমি নিয়ে নেওয়ায় চাষীরা বিরোধী হয়ে উঠল। সিঙ্গুর নিয়ে মমতার সঙ্গে সংঘর্ষে ব্যাপক মানুষ বিরোধী হলো। শোনা যায়, রাজ্যপালের সামনে বসে বুদ্ধদেব যে চুক্তি করে এসেছিলেন তা নাকি নিরুপম সেন বাতিল করে দিয়ে বলেছিলেন, ''কে অধিকার দিয়েছে।'' আসলে রাজ্য সিপিএম-এর নেতৃত্ব বর্ধমান গোষ্ঠীর কব্জায়। তাঁদের তুষ্ট রাখার জন্য মেরুদণ্ডহীন রাজ্য-সম্পাদক বিমান সদাই ব্যস্ত। নেপথ্যে চলে গেলেও সমস্ত কলকাঠি নাড়ছেন বর্ধমানের সাঁইবাড়ি হত্যার নায়ক বিনয় কোঙার।

উল্লেখ করা প্রয়োজন বর্ধমানের প্রয়াত নেতা বিনয় চৌধুরীর আমলেই যা বর্গাদারের ব্যবস্থা হয়েছিল। তারপর থোড়-বড়ি-খাড়া কাজ হয়েছে। শিল্পায়নের উদগ্র বাসনায় অথবা নিজেকে জ্যোতি বসুর থেকে উচ্চাঙ্গের প্রমাণ করার জন্য টাটার মতো একেচেটিয়া পুঁজিপতির কাছে আত্মসমর্পণ— এটা দাস্য ভাবের প্রকাশ মাত্র। প্রসঙ্গ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নিয়ে সিপিএম-ছাড়া বামফ্রন্টের সব কথাই বিরোধিতা করেছিলেন—এখনও এইসব দলগুলির নির্বাচন সংক্রান্ত পর্যালোচনায় বুদ্ধবাবু-নিরুপম চিহ্নিত হয়েছে।

সিপিআই-এর সাধারণ-সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের বিপর্যয় সম্বন্ধে বলেছেন, ''এটা নির্বাচনী পরাজয় নয়, এটা রাজনৈতিক পরাজয়। কারণ পশ্চিমবঙ্গকে দেখিয়ে সারা ভারতবর্ষ বামপন্থী আন্দোলন এগোবার দিকে যেতো।'' এখন আর তা হবার নয়। সিপিএম বুদ্ধদেবের মতো কংগ্রেস তথা মনমোহন সিং-প্রণব মুখার্জি-কে তোষণ করে চলতে চায়। নতুবা টাটা এবং সালিম গোষ্ঠীর পদতলে পড়ে শিল্প-ভিক্ষা করা। কাজেই এই ইস্যুতে যদি রেজ্জাক মোল্লাকে কোনও কঠোর শাস্তি দেওয়া হয় তবে পার্টিতে বিদ্রোহ হবে। সিঙ্গুরের চুক্তির সময়ে হুগলী পার্টিকে

এমনকী পার্টির রাজ্য-কমিটিকে সর্বোপরি বামফ্রন্টের শরিকদের অন্ধকারে রেখে গোপনে চুক্তির ব্যাপারটা সেরে ফেলে দিয়ে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে বোফর্স-চুক্তির কথা মনে এসে যায় নাকি? এই লেনদেন এ কোনও স্বচ্ছতা ছিল না। নন্দীগ্রামের ঘটনা আরও চমৎকার। হলদিয়ার সম্রাট লক্ষ্মণ শেঠ জমি দখলের নোটিশ জারি করেছিলেন। সমালোচনা উঠলে বুদ্ধদেববাবু বলেন, ''নোটিশটা ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হোক।'' চমৎকার আচরণ। সরকারি বিজ্ঞাপন ছিঁড়ে ফেলতে পরামর্শ দিলেন বুদ্ধদেববাবু। বুদ্ধবাবুর শপথের পর প্রথম ভিজিটার ছিলেন রতন টাটা। তিনি বলেছিলেন ''যাক আপনি এসে গেছেন।'' খোলা আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। বামফ্রন্ট-এর নির্বাচনী বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ বুদ্ধবাবুদের ঔদ্ধত্য এবং গরিব মেরে ধনিক- বণিকদের তোষণ। শ্রমিক কৃষকের স্বার্থ না দেখে শুধুমাত্র দম্ভের বলে শাসন চালানোর ফল পেয়েছেন। বুদ্ধবাবুদের দেখাদেখি বা অনুসৃত আচরণ অনুযায়ী গ্রাম-শহরে বহু মনসবদার-জমিদার-প্রমোটার তৈরি হয়ে লুঠেরার দলে পার্টি ভরে গেলো। এ-ব্যাপারটায় সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কি করেছিলেন? তাঁরা জানতেন না অথবা মেনেও হস্তক্ষেপ না করার নীতি নিয়েছিলেন কেন? শ্রমিক-বস্তিবাসী-গ্রামের অনুন্নতদের দিকে লক্ষ্য না রেখে আকাশচুম্বী প্রাসাদ-বিশিষ্ট এক বিলাসী ব্যয়বহুল নগরোন্নয়নের নামে প্রমোটারদের কব্জায় চলে গেলেন। মনে পড়ে এক টেন্ডারদাতা নাকি মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীকে একটি বাড়ি বিনামূল্যে দিয়ে গেছেন? আর সেই বাড়ি প্রায় কোটি টাকা ব্যয় করে সজ্জিত করা হয়েছে। সল্টলেকের সাধারণ মানুষ দেখেছিলেন—ভোটে রমলা চক্রবর্তীকে জবাব দিয়েছিলেন। এঁদের কি কোনও লজ্জা নেই?

পার্টির মধ্যে সম্মেলনে ভোটাভুটিটাই সার—কেবল কে হবে নেতা— সেটাই মুখ্য। পার্টির দলিল ক্ষমতালোভী নেতারা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নেতৃত্ব দখলের লড়াইতে মত্ত। কারণ পার্টির কেষ্ট-বিষ্টু হতে পারলে ''গুছাইয়িত'' হওয়া যায়। এসব নেতারা যা করে গেছেন—তার পুত্র-নাতিদের কষ্ট হবে না। ফলে পড়ছে—পড়বে—ভ্যাবলারাম বোকা-সৎ মানুষরা। তাঁদেরকে এখনও দেখা যায় প্রায় ভিক্ষার ঝুলি হাতে পুত্র-কলত্রদের অন্ন যোগানোর জন্য হন্যে হয়ে দ্বারে দ্বারে রোজগার করে যাচ্ছে। তাদের অভিশাপ কি ব্যর্থ হয়?

তাই বঞ্চিত মানুষ ভোট দিয়েছেন বিপুলভাবে। কারণ পেশিশক্তি ভোট দানে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। ভোটদানে বাধা সৃষ্টির জন্য সিপিএম জেলায় জেলায় অস্ত্র ভাণ্ডার মজুত করেছিল। সেসব আজ সামনে চলে এসেছে। কলকাতাসহ রাজ্যের ৭০টি শিল্পতালুকে বামফ্রন্ট বিপর্যস্ত। হুগলির শিল্পাঞ্চলে সিপিএম নিশ্চিহ্ন। পোর্ট-ডক-খিদিরপুরসহ কোনও শিল্পে সিপিএম কাজ করে না—মালিকদের তুষ্ট করার চেষ্টা করেছে। তাই তো জাল কীটের তদন্ত চাপা পড়ে যায়। চাপা পড়ে যায় সিপিএমের রাজ্যদপ্তরের কোষাধ্যক্ষ বৃদ্ধ সুশীল পালকে কে বা কারা খুন করে ফেলে যায়? তদন্ত হওয়া দরকার। তাহলে অপকর্মের সন্ধান মিলবে।

নানা স্তরের নেতারা গাড়ি-বাড়ি-সম্পত্তি করে ক্ষান্ত হয়ে দাদা-মন্ত্রীকে তোষামোদ পরিজন- স্বজনকে ভরিয়ে দিয়েছেন আর্থিক সুযোগে। বিরোধীরা একটা ভুল কথা বলেন তা হলো ক্যাডার পোষণ—না; নিচের তলার মধ্যবিত্ত গরীব চাষী-শ্রমিক পরিবারের কমরেডরা কিছুই পাননি। আর এরাই এবারে জান-প্রাণ দিয়ে খেলেছেন, আর বাবুদের সুবিধা ভোগীরা বসন্তের কোকিলের দল। সম্পদের নতুন উৎস খোঁজার জন্য আবার জনতার ভিড়ে মিশে গিয়ে তোষামুদি করে, রসদ জুগিয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রে ঢোকার চেষ্টা করছে। অমিয় সাগরে সিনান করিয়া সকলি গরল ভৈল।'' কেন এই অবস্থা—সেটা করা তবে আলোচনায় করার ইচ্ছা নামলো। আসলে ভোগবাদী আদর্শের এটাই পরিণত ঘটে পৃথিবীর দেশে দেশে। ভাবুন নিপীড়িত কমরেডগণ।

এই সময়

মন্ত্রী-যুদ্ধ

ভারতে উচ্চমানের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষকদের মান নিয়ে পরস্পর বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার অগ্রণী প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ টেকনোলজি এবং ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার অগ্রণী প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ ম্যানেজমেন্টের শিক্ষকদের প্রতিভা ও মেধা নিয়ে ইতিপূর্বেই একটি খোঁচা মেরেছিলেন পরিবেশমন্ত্রী জয়রাম রমেশ। কৃতী ছাত্র রমেশকে সেই খোঁচাটাই ফিরিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় মানব-সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী কপিল সিবাল। পরিবেশমন্ত্রীকে তাঁর মন্তব্যের জন্য 'স্বতন্ত্র' মন্ত্রী আখ্যা দিয়ে সিবাল বলেছেন, আই আই টি-র শিক্ষকদের মধ্যে ২৫ শতাংশই আই আই টি-র প্রাক্তন ছাত্র এবং তারা অবশ্যই 'বিশ্বমানে'র।

জেলবন্দী ভরদ্বাজ

কর্ণাটকের ইয়েদুরাপ্পা সরকার বরাবরই তাঁর গাত্রদাহের বস্তু। আসলে প্রথম ইউ পি এ সরকারের আইনমন্ত্রী থাকাকালীন বামেদের ঘনিষ্ঠ এই নেতাটি'র দু'চোখের বিষ ছিল বিজেপি। সেই বিজেপি বিদ্বেষেরই সাম্প্রতিকতম নিদর্শন—বিজেপি-শাসিত কর্ণাটকে বিনা কারণে রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ। প্রাক্তন আইনমন্ত্রীর এই সুপারিশে শতচেষ্টা করেও কোনও আইনী-যুক্তি খুঁজে না পাওয়ায় কেন্দ্র বাতিল করতে বাধ্য হয় সুপারিশটি। নিজের দলের সরকারের এহেন সিদ্ধান্তে রীতিমতো বেসামাল ভরদ্বাজ তাঁর হতাশা গোপন না করতে পেরে বলেছেন—'কর্ণাটকের রাজভবনকে ঠিক জেলের মতো লাগছে। যেখানে আমি একটা 'জেল পাখি।'

২৬/১১ প্রশ্রয় কার্যকর

তাদের মূল শত্রু ৯/১১-এর প্রধান হোতা ওসামা বিন লাদেনকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়া হয়ে গেছে। তাই খামোকা আর বিশ্ব-সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়ে হবেটা কি? বিশ্ব জুড়ে সন্ত্রাসবাদীরা যেমন আছে, তেমনই থাক না বাবা! যখন-যেমন, তখন-তেমন নীতি নিয়ে দিব্যি কাজে লাগানো যাবে। লাদেনরই মতো আবার কেউ বাড়াবাড়ি শুরু করলে প্রয়োজনমতো শিরশ্ছেদ করতেও বেশি সময় লাগবে না। এহেন মার্কিন নীতির সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়ে লাদেন পরবর্তী পাকিস্তানে 'উত্তেজনা' প্রশমন করতে সেখান থেকে ক্রমশ মার্কিন সেনা সরাতে উদ্যোগী হয়েছে ওবামা প্রশাসন। এতে ভারতে ২৬/১১ প্রশ্রয় পেলই বা, তা বলে আমেরিকা পাক-বাবাজীকে সন্তুষ্ট করবে না? এ কেমন কথা!

পাক-সন্ত্রাস অব্যাহত

এমনটাই স্বাভাবিক ছিল। ভারতের পাঠানো ৫০ জন 'মোস্ট ওয়ান্টেড' সন্ত্রাসবাদীর নাম পাকিস্তান সরাসরি খারিজ করে বলেছে ওই সন্ত্রাসবাদীরা তাদের দেশের নাগরিকই নয়। সংবাদ-সংস্থা প্রেরিত সূত্র মোতাবেক জানা যাচ্ছে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রক থেকে এদেশের বিদেশমন্ত্রকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে যে ভারতের উচিত ওই ৫০ জন সন্ত্রাসবাদী যে পাকিস্তানেই রয়েছে সে-সম্পর্কে নিশ্চিত সূত্র দেওয়া। কারণ ইতিমধ্যেই দু'জন সন্ত্রাসবাদী পাকিস্তান ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ। এহেন কারণ দর্শিয়ে ভারতের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' সন্ত্রাসবাদীর তালিকাটা ভারতের বিদেশমন্ত্রককে সটান পাঠিয়ে দেয় পাকিস্তান। প্রশ্ন ওঠে, দু'জন না হয় নেই, কিন্তু বাকি ৪৮ জন সম্পর্কে কি বলবে পাকিস্তান? প্রসঙ্গত, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ওই তালিকাটি পাকিস্তানের ভারতীয় হাইকমিশনারের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

কাসভের দায়

কাসভের দায়ভার (পড়ুন অর্থভার) নিতে অপারগ মহারাষ্ট্র সরকার। দক্ষিণ মুম্বইয়ের আর্থার রোডের জেলে কাসভকে উচ্চস্তরীয় নিরাপত্তা দিতে গিয়ে এবিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ মহারাষ্ট্র সরকারের কাছে ১০ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার বিল ধরিয়েছে। পুলিশের ডিজি আর কে ভাটিয়া জানিয়েছেন ২০০৯-এর ২৮ মার্চ থেকে ২০১০-এর ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আর্থার জেলবন্দী কাসভকে নিরাপত্তা দেবার জন্য তাঁরা ওই পরিমাণ অর্থ খরচ করেছেন। বিল দেখে মহারাষ্ট্রের কংগ্রেসী সরকারের চক্ষু-চড়কগাছ। মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে ওই বিপুল পরিমাণ অর্থ সরকার ব্যয় করতে পারবে না। জনৈক রসিকের রসিকতা—২৬/১১-র অভিযুক্তটি (অর্থাৎ কাসভ) শুধু ভারতীয়দের প্রাণেও মারেনি, ধনেও মেরেছে।

গগৈ পরিবারতন্ত্র

স্বপ্নেও যেটা ভাবেননি অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ, এবার তাই হয়েছে বিধানসভা নির্বাচনে। বিপুল ভোটে জিতে মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে পুনরায় আসীন হয়েছেন তিনি। অপদার্থ বিরোধীপক্ষ কিংবা অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাঙ্ক গগৈ-এর সাফল্যের জন্য যে ব্যাখ্যাই দিন না কেন, কংগ্রেসী পেটেন্ট নিয়ে আর কিছুতেই কাল-বিলম্ব করতে রাজি নন তরুণ গগৈ। কংগ্রেসী পেটেন্ট মানে বুঝলেন তো? আরে বাবা, পরিবারতন্ত্র। এই বিষয়টার পেটেন্ট স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে কংগ্রেসের মতো আর কেই বা নিয়েছে বলুন! সুতরাং সর্বশেষ সমাচার যে পরিবারতান্ত্রিক পেটেন্ট মেনেই স্বয়ং তরুণ তাহার তরুণ পুত্র গৌরবের জন্য অসীম গৌরবান্বিত হইয়া তাঁহার রাজ্যাভিষেক থুড়ি রাজনীতিতে আগমনের কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

৩৪ বছরের বাম-শাসনের অবসান

রাহুমুক্তি ঘটল পশ্চিমবঙ্গে

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

ইতিহাস থেকে জেনেছি—ফ্যাসিবাদী শাসন চিরস্থায়ী হতে পারে না। চৌত্রিশ বছর একটানা ক্ষমতায় থাকার ফলে মার্কসবাদী শাসকরা একটা একনায়কসুলভ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। প্রদীপের নিচে কখন অন্ধকার জমেছে, ক্ষমতার মোহে তাঁরা সেটা বোঝেননি। সেই কাজের শাস্তি পেতে হবে না?

ইতিহাসের প্রতিশোধ কাকে বলে?

এর দাম্ভিক, উন্নাসিক ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে বিরোধী দলের আসনগত স্বল্পতা নিয়ে উদ্ধত কণ্ঠে বলেছিলেন—'ওদের ৩০, আর আমাদের ২৩৫, ওদের কথা শুনব কেন।'

কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই এক নীরব বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পট-পরিবর্তন হলো। এবার আসন সংখ্যা ৪০, শরিকদের নিয়ে ৬২—আর ওদের ২২৭।

এটাও কি গ্রীক্—ট্র্যাজেডীর 'জেনেসিস'?

ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছিল স্বৈরতন্ত্রের পুরনো সৌধটা। মমতা ব্যানার্জীর মতো ক্ষুদ্র এক বট-চারা ভেতরে ভেতরে কুরে কুরে খেয়েছে তার পুরো কাঠামোটাকে। আত্মগর্বী বাম-নেতারা বোঝেনি। আমলা, পুলিশ, ক্যাডার আর ক্রিমিনালকে হাতে পেয়ে তারা ভেবেছে চৌত্রিশ বছর কেন, অনন্তকাল দখলে থাকবে রাজ্যপাট। লর্ড অ্যাক্টনের কথাটা—'All power corrupt and absolute power corrupts absolutely' কেউ পড়েনি, কেউ মনে রাখেনি দোর্দণ্ডপ্রতাপ স্ট্যালিন সাম্রাজ্যের পতনের কাহিনীটা। হোনেকার চেসেস্কুর কথাটাও মনে আসেনি আত্মগর্বের সোনালী সময়টাতে।

কিন্তু আমরা তো দলীয় রাজনীতির বাইরে থেকেও এর আভাস পেয়েছিলাম। লোকসভা নির্বাচন, পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ও কলেজের গভর্নিং বডির নির্বাচন, কলেজে ছাত্র- সংসদের নির্বাচন ইত্যাদি এক আসন্ন ঝড়ের আভাস দেয়নি? আমরা পত্র- পত্রিকায় লিখিনি যে, এবার বামরা ৮০-র বেশি আসন পাবে না? পাকা মাথার পোড়খাওয়া বাম-নেতারা এসব বোঝেনি কেন?

এই দেশে বামফ্রন্টের বড়, মেজ, সেজ ও ছোটবাবুরা একেবারে ক্ষেপে গেলেন কেন? কেউ বলেছেন—এগুলো পাগলামো, কেউ বলেছেন— অতীতেও এভাবে বামফ্রন্টকে বহুবার মানসিক দিক থেকে হীনবল করার চেষ্টা হয়েছে। কেউ আবার সদম্ভে বলেছেন, নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতার জন্য যত আসন দরকার (অর্থাৎ ১৪৮) তার চেয়ে ১৫/২০টা বেশি আসন তাঁরা পাবেনই। মুখ্যমন্ত্রী সিংহগর্জনে দাবি করেছিলেন—অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার হবেই। জনগণ নাকি আছেন তাঁদের সঙ্গে।

কেউ কেউ অবশ্য বুঝেছিলেন যে, দলের ভিতটাই নড়ে গিয়েছে। এই কারণে বারবার 'শুদ্ধি', ভুল স্বীকার, ক্ষমা প্রার্থনা, ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান ও সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাৎপর্যের বিষয় হলো—তাঁরা ভুলের কথা স্বীকার করেন, কিন্তু ভুলের সংশোধন করেন না—নত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু একই সঙ্গে বলেন—সিঙ্গুরে কারখানা হবেই। সিঙ্গুর- নন্দীগ্রামের মাটি রক্তে ভিজিয়ে দিয়েও বলেন—সেখানে ত্রুটি হয়েছিল, কিন্তু সেই পথেই শিল্পায়ন হবে।

দলীয় শক্তির দম্ভে এই সব নেতারা মনে করেছিলেন, ক্ষমতাকে ধরে রাখা যাবেই ক্যাডারের জোরে—সঙ্গে দলদাস পুলিশ তো আছেই। কিন্তু অপরাজেয় শক্তি নিয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। বন্দুকের নল নয়, গুণ্ডার পেশীশক্তি নয়— সর্বশক্তিমান হলো মানুষের ঐক্য ও ত্যাগস্বীকারের ব্রত। টিভিতে দেখেছিলাম— পুলিশের পাশব শক্তির সামনে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের অসহায় মানুষের ব্যর্থ প্রতিরোধ স্পৃহার ছবি। আমরা কিন্তু তখনই বলেছিলাম —জনগণের এই পরাজয় প্রাথমিক ও সাময়িক একটা ব্যাপারমাত্র, বামফ্রন্ট নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছে। কিছু মানুষের দুঃখ, অশ্রু, মৃত্যু ও ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে সেই অবাম সংগ্রাম ক্রমে এক জন-বিপ্লবে পরিণত হয়েছে, সফল হয়েছে রাইটার্স দখলের এক ঐতিহাসিক ও শান্তিপূর্ণ অভিযান। বিপ্লবটা ছিল মানুষের। মমতা ব্যানার্জী তাঁদের ভয় ভেঙে দিয়ে টেনে নিয়ে এসেছেন অভয়ের পথে।

ইতিহাস থেকে জেনেছি—ফ্যাসিবাদী শাসন চিরস্থায়ী হতে পারে না। চৌত্রিশ বছর একটানা ক্ষমতায় থাকার ফলে মার্কসবাদী শাসকরা একটা একনায়কসুলভ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। প্রদীপের নিচে কখন অন্ধকার জমেছে, ক্ষমতার মোহে তাঁরা সেটা বোঝেননি। সেই কাজের শাস্তি পেতে হবে না?

অবশ্য প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কোকরে তাঁর 'রিসেন্ট পলিটিক্যাল থট' গ্রন্থে লিখেছেন, তত্ত্বগত পার্থক্য থাকলেও ফ্যাসিবাদ ও কম্যুনিজমের মধ্যে ব্যবহারিক দিক থেকে কোনও তফাৎ নেই—কারণ দুটোই দাঁড়িয়ে থাকে পাশবিক শক্তির ওপর ভর করে। দুটোই একতন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন রূপ—এই কারণে গণতন্ত্রই এই ধরনের

ব্যবস্থায় ধ্বংস হয়ে যায়। হার্নশ-র ভাষায়—'While democracy stands upon two force of argument, dictatorship stands upon the argument of force...democracy counts heads, dictatorship breaks them।'

বৃটেনে প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ করেন, বিল তৈরি করেন। স্যার জেনিংস্ লিখেছেন, 'Many proposals of the government are not opposed, because there is general agrument (দ্য বুইন্'স্ গভর্নমেন্ট, পৃ: ৮৭)। অনুরূপভাবে এস ই ফাইমার মন্তব্য করেছেন, 'The Cabinat spend a dialogue with the opposition' —(কম্পারেটিভ গভর্নমেন্ট, পৃ: ১৫১)। আর এখানে দাম্ভিক মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের পাত্তাই দেন না, বিরোধী-নেত্রীর নাম মুখেই আনেন না ঘৃণায়, ক্রোধে।

এই ধরনের শাসনব্যবস্থা শুধু বিরোধী দলকে নয়---সব বিরোধী শক্তিকেই গুঁড়িয়ে দিয়ে একটা ধ্বংসাত্মক বীভৎসার জন্ম দেয়, তখন স্বৈরাচার একটা নগ্ন রূপ নেয়। জ্যোতি বসুর সময় এই নগ্ন প্রক্রিয়ার শুরু হয়েছিল---বুদ্ধবাবুর স্পর্শে যার পরিণতি ঘটেছে।

এরা ক্ষমতায় এলে কি হতে পারে—তার আভাস মিলেছিল ১৯৭০ সালের সাঁইবাড়ি ঘটনা থেকে। ১৯৭৭ সালে তারা ক্ষমতা দখল করার পর বিজনসেতু, বানতলা, ধানতলা, সূঁচপুর, ছোট আঙারিয়া, কেশপুর, নেতাই, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম ইত্যাদির নারকীয় ঘটনা ঘটেছে। অবাধে চলেছে বাইক বাহিনীর এলাকা দখলের অভিযান, চলেছে লুঠপাট, গৃহদাহ, নরহত্যা, ধর্ষণ, ভীতি-প্রদর্শন ইত্যাদির বীভৎসতা। পুলিশ ও প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় করে রেখে চলেছে হার্মাদদের দৌরাত্ম্য। হাজার হাজার মানুষকে ত্রাণ-শিবিরে আশ্রয় নিতে হয়েছে। কোথাও কোথাও পুলিশের সঙ্গে খাঁকি উর্দি পরে খালি পায়ে বা চটি পরে তাণ্ডব চালিয়েছে নরপশুর দল। বিরোধীদের ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে খেলা হয়েছে, হাত চিহ্নে ভোট দেওয়ার অপরাধে হাতের পাঞ্জা কেটে নেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার কারণে মাস্টারমশাইকে জুতোপেটাও করা হয়েছে। তাপসী মালিক, রাধারাণী আড়ি প্রমুখ নারীদের ধর্ষণ করা হয়েছে। তাপসী মালিককে হত্যা করে ব্যর্থ প্রেম-জনিত আত্মহত্যার কাহিনী ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটা মেনে নিয়েছে বশংবদ সি আই ডি.-ও। জননী ইটভাঁটায় সি. আর. পি. কম্‌রেডদের ধরেছে সশস্ত্র অবস্থায়—অথচ দলদাস পুলিশ তাদের ছেড়ে দিয়েছে। দুজন মন্ত্রী জামিন-অযোগ্য ওয়ারেন্ট নিয়ে এত বছর রাইটার্স আলো করে আছেন—পুলিশ তাঁদের খুঁজে পায় না। বিভিন্ন থানায় ৭০ হাজারের মতো ওয়ারেন্ট জমে ছিল—অভিযুক্তদের প্রায় সবাই ক্যাডার, সুতরাং পুলিশ রয়েছে নিষ্ক্রিয় হয়ে।

আমরা জানতাম ফৌজদারী মামলা তার নিজের পথেই চলে। কিন্তু সাঁইবাড়ির সেই নারকীয় হত্যা-মামলা তুলে নেওয়া হয়েছে—অপরাধীদের মধ্যে কেউ হয়েছে মন্ত্রী, কেউ সাংসদ, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার। নিষ্ঠুর খুনীদের কেউ কেউ হয়ে উঠেছে 'দলের সম্পদ'। তারা নেতার পাশে মঞ্চে বসে। অবিরত 'অ্যাক্‌শান' চালায়। পুলিশ তাদের কিন্তু দেখতে পায় না।

এটা স্বৈরতন্ত্র নয়?

বানতলায় অনীতা দেওয়ানকে হত্যা করে পাটভাঙা শাড়ি-ব্লাউজ পরানো হয়েছিল—যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু পোস্ট্ মর্টেমের সময় তাঁর ক্ষতবিক্ষত নিম্নাঙ্গ দেখে লেডী ডাক্তার মূর্ছা গিয়েছিলেন। সাঁইবাড়িতে ছেলেকে মেরে রক্তমাখা ভাত মাকে খাওয়ানো হয়েছিল। ছোট শিশুকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল উনুনে। ছোট আঙারিয়ায় মানুষ খুন করে লাশ গুম করা হয়েছে। মরিচঝাঁপিতে মানুষকে পুড়িয়ে, খুঁচিয়ে মারা হয়েছে, জলে বিষ মেশানো হয়েছে, লঞ্চে করে বহু মানুষকে নিয়ে সাগরের কাছে বাঘ-কুমীরের মুখে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

এটা মার্কসবাদীদের শাসন? এটা কি হিট্‌লার-স্ট্যালিন, মুসোলিনীর যুগকে মনে করিয়ে দেয় না? দ্রৌপদীকে চুল ধরে টেনে নেওয়া হয়েছিল রাজসভায় —তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন প্রতিশোধ নেওয়া না হলে তিনি চুল বাঁধবেন না। মমতা ব্যানার্জীকেও চুলের মুঠি ধরে রাইটার্স থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন জানি না—এবার তিনি কিন্তু রাইটার্স দখল করেছেন। সেই জুতোপেটা খাওয়া মাস্টারমশাই এবার জুতো পরবেন। দ্রৌপদীরা এবার চুল বাঁধবেন, হাসবেন, ঘুমোবেন। তাপসী-মলয়ের আত্মা এবার শান্তি পাবে। রাহুমুক্ত হয়েছে পশ্চিমবাংলা।

বুথ ফেরত সমীক্ষা ছিল এই রকম—

দল	আসন বামফ্রন্ট	আসন বিরোধী জোট
স্টার-আনন্দ	৬২	২২০
মহুয়া খবর	১০০	১৮৭
হেডলাইন্ড টুডে	৬৫-৭০	২১০-২২০
আই. বি. এন.	৬০-৭২	২২২-২৩৪

লোকসভা নির্বাচন, পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ও কলেজের গভর্নিং বডির নির্বাচন, কলেজে ছাত্র- সংসদের নির্বাচন ইত্যাদি এক আসন্ন ঝড়ের আভাস দেয়নি? আমরা পত্র- পত্রিকায় লিখিনি যে, এবার বামরা ৮০-র বেশি আসন পাবে না? পাকা মাথার পোড়খাওয়া বাম-নেতারা এসব বোঝেনি কেন?

প্রজাদের মারলে তারাও ছেড়ে কথা বলবে না

অতিথি কলম

ডঃ জয় দুবাসী

আমাদের পুরোনো বন্ধু কর্নেল মুয়াম্মার গদ্দাফি এখন বাঁচার জন্য হাঁসফাঁস করছেন। ৪০ বছর ধরে তাঁর হতভাগ্য প্রজাদের শাসন করে তিনি এখন চিন্তায় পড়েছেন কেন তারা তাঁকে উৎখাত করতে চাইছে। একমাত্র তারাই যে তাঁকে সরাতে চাইছে তা নয়, সারা জাহাঁ তাঁর ও তাঁর সাকরেদের বিরুদ্ধে চলে গেছে। তাঁর সাধের তাঁবুতে বসে এখন শেষ মুহূর্ত গুনছেন।

তিনি একক নন। সারা আরব দুনিয়া—অর্থাৎ কিনা গোটা মুসলিম দুনিয়া—স্বৈরতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে। প্রথম যাঁর পতন হলো তিনি হোসনি মুবারক। তিনি ছিলেন পশ্চিমীদের বিশ্বস্ত দোস্ত। তার পরে এসেছে গদ্দাফি এবং তাঁর সাকরেদদের পালা।

গদ্দাফির পর বাহরাইনের শাসকরা এখন গণরোষের মুখে। তাঁরা তাঁদের ঠাকুর্দা সৌদি আরবের সাহায্য চেয়েছেন। বাহরাইনের পর পালা আসছে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আলি আবদুল্লা সালেহর। ইয়েমেনের পর দুবাই এবং অন্যান্য আমীরদের উপর আক্রমণ আসন্ন। মোট কথা হলো আরব দুনিয়া ভেঙ্গে পড়ছে। বালির তলায় মজুদ করা ব্যারেল ব্যারেল তেল আর তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

এইসব দেখে আপনার কি কিছু মনে পড়ছে? আপনি কুড়ি বছর পিছনে ফিরে তাকান তো। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কি চোখে পড়ছে না? ঠিক কুড়ি বছর আগে এরকমই একটা জগৎ আপনার সামনে ভেঙ্গে পড়েছিল—সে জগৎ আরব জগতের মতো ছিল বিশাল এবং মনে হয়েছিল অবিনশ্বর। আমি সেই সময় লন্ডনে ছিলাম। ভাবছিলাম মস্কো, নয়ত স্পেনে, বিশেষত বার্সেলোনায় যাব যেখানে জর্জ অরওয়েল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্টালিনের দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। অবশেষে আমি মস্কো যাবার পরিকল্পনা ত্যাগ করলাম, কেননা সেসময় সে জায়গা নিরাপদ ছিল না। আমি তাই গেলাম স্পেনে। আমার অনুপস্থিতিতে সোভিয়েট সাম্রাজ্য পড়ল ভেঙ্গে—টুকরো টুকরো হয়ে।

সোভিয়েট রাষ্ট্র ঠিক সেভাবে ধ্বংস হয়েছে যেভাবে আজ আরব দেশগুলি ধ্বংস হচ্ছে। কেউ সোভিয়েট দেশ আক্রমণ করেনি, যেমন কেউ রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া বা হাঙ্গেরিকে আক্রমণ করেনি। এই দেশগুলি নিজেদের পাপেই ধ্বংস হয়েছে। সত্যি, আরব দেশগুলি তাসের মতো ভেঙ্গে পড়ছে আর এই দেশগুলির স্বৈরতন্ত্রীরা সুইস ব্যাংকে তাদের গোপন টাকা গুনছে তাড়াতাড়ি কোথাও ভেগে পড়বে বলে।

এদের ধ্বংস করার জন্যে পশ্চিমী রাষ্ট্রদের দরকার হয়নি। এরা স্বাভাবিক কারণে ধ্বংস হবে এই ছিল এদের নিয়তি। যেমন সোভিয়েট রাষ্ট্র ক্রেমলিন থেকে বিতাড়িত হবে এমনি ছিল নিয়তি।

এর কারণ কি? আসল ঘটনা হলো ইসলাম যতটা ধর্ম তার চেয়ে বেশি রাষ্ট্রমত। যেমন কিনা নাৎসীবাদ বা ফ্যাসীবাদ। এই বিষয়টি পরিষ্কার হবে যদি একটু খতিয়ে দেখি। মুসলিমরা কোরাণের শিক্ষার বিরুদ্ধে কিছু করা তো দূরে থাক কিছু বললেই তাদের খতম করা হয়, যেমন কিনা কমুনিস্টরা আর নাৎসীরা করেছে।

যোসেফ স্ট্যালিন কুলাক নামক লাখো লাখো ক্ষুদ্র চাষীদের হত্যা করেছিলেন, কারণ তারা স্টালিনের মার্কসীয় তত্ত্ব মেনে তাঁকে তাদের জমি দিতে অস্বীকার করেছিল। স্ট্যালিন ক্রেমলিন এবং অন্যত্র বিচারের প্রহসন করে হাজার হাজার মানুষকে পাঠিয়েছিলেন গুলাগ নামে বন্দীশালায়। এরা কেউ কমুনিস্ট-বিরোধী ছিল না, ছিল পার্টির বিশ্বস্ত কর্মী। এদের অপরাধ এরা পার্টির লাইন মেনে চলেনি।

গত মাসে পাকিস্তানের জারদারী সরকার দুজন অফিসারকে হত্যা করেছে—এদের একজন মুসলিম,

আরব দেশে গণরোষ

অন্যজন খৃস্টান। এদের অপরাধ এরা ব্লাসফেমি আইন সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। ঠিক এটাই কমুনিস্টরা করে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের চূড়ান্ত সময়ে হাজার হাজার পোলিশ সৈন্যকে হত্যা করা হয়েছিল। কারণ স্ট্যালিন ওদের আনুগত্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। অনুরূপভাবে ইরাণের নাদির শাহ দিল্লির হাজার হাজার হিন্দু শিশু, নারী, পুরুষদের হত্যা করেছিলেন। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা ছিল হিন্দু, যেমন কিনা স্ট্যালিনের চোখে কুলাকদের অপরাধ এই ছিল যে তারা কার্ল মার্কসের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল না—তারা বিশ্বাস করত তাদের নিজেদের ঈশ্বরদের। ইসলাম এবং কম্যুনিজমে ভাল নাগরিক হওয়া বড় কথা নয়, বড় কথা হলো তাদের খাঁটি মুসলমান বা খাঁটি কমুনিস্ট হতে হবে। কম্যুনিস্টদের ধর্মগ্রন্থ 'ডস ক্যাপিটাল'-এ বিশ্বাস না করলে তাকে শত্রু বলে গণ্য তো করা হয়ই, উপরন্তু তাকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়। তেমনি কোরাণের আদর্শ যারা গ্রহণ করে না তারা অবিশ্বাসী—তারা কাফের—তারা বেঁচে থাকার যোগ্য নয়।

সমস্ত স্বৈরতন্ত্রী দর্শন বর্বর। এই তত্ত্বের মূল কথা হলো হিংস্রতা ও ক্রূরতা। এডলফ হিটলার ইহুদীদের সরকারী চাকরী থেকে বিতাড়িত করেই ক্ষান্ত হননি তাদের হত্যা করেছিলেন—তাদের বাড়ী ও অফিস থেকে ঠেলে-ঠুলে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে এভাবে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন ছয় লক্ষ ইহুদীদের। এবং যখন এই দৈত্য বার্লিনে তাঁর বাংকারে আত্মহত্যা করেছিলেন তখন তিনি তাঁর এক জেনারেলের কাছে গর্ব করে বলেছিলেন যে ইহুদী হত্যা তাঁর একটি মহান কাজ।

সৌদী আরবে মেয়েদের প্রকাশ্যস্থলে ঢিল মেরে হত্যা করা হয়। এবং এই কাজটি অন্য ইসলামিক রাষ্ট্রেও ঘটে। সৌদি আরব মুসলিম দেশগুলির শীর্ষে। তেলে সমৃদ্ধ। আশা করা যায় এহেন দেশ তার নাগরিক মায় নারীদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবে। তালিবানরা, যাদের খাঁটি ইসলামের প্রতিভূ বলে ভাবা হয় তারা মেয়েদের স্কুলে যেতে নিষেধ করে, এমনকি আরবী অক্ষর শিখতে আপত্তি করে পাছে তারা ভুল বার্তা পায়। অতএব আশ্চর্য নয়, মুসলিম দেশগুলি পৃথিবীর বেশিরভাগ তৈলভাণ্ডারের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলির অন্যতম।

এই কথা কমুনিস্টদের বেলায়ও খাটে। স্ট্যালিন অনেক স্টিল প্ল্যান্ট, অনেক পাওয়ার স্টেশন, অনেক দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর দেশের মানুষদের রুটি, মাখন, পরিধেয় ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেননি। কারণ তাঁর ছিল তাদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা, সাইবেরিয়ার বন্দিশালায় তাদের পাঠাতে তাঁর বিবেকের দংশন হয়নি। হিটলার—আর এক স্বৈরতন্ত্রী—ইহুদী এবং অন্যান্য অ-নাৎসীদের গ্যাসচেম্বারে পাঠিয়েছিলেন। কর্নেল মুয়াম্মার গদ্দাফি তাঁর প্রজাদের অবজ্ঞা করেন এবং হেলিকপ্টার থেকে গুলি করেন। সৌদিরা মেয়েদের ঘৃণা করে এবং বন্দী করে লোকজনের সামনে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করে। তাহলে ভাবুন কেন স্ট্যালিনের রাশিয়া হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে, কেন হিটলারের জার্মানী ধূলিসাৎ হয় এবং নাৎসী নেতাকে আত্মহত্যা করতে হয়, পাগল কর্নেলকে শেষ গুলির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। আসল কথা হলো তুমি তোমার প্রজাদের হত্যা করলে তোমার প্রজারাও তোমাকে হত্যা করবে।

জেহাদী সন্ত্রাসের কারখানা পাকিস্তান

মেঃ জেঃ কে কে গাঙ্গুলী (অবঃ)

৯ মে আবোতাবাদে নিহত আল কায়েদা প্রধান ওসামা বিন লাদেন। ভারত তথা বিশ্বের বহু রাষ্ট্র বহুদিন থেকে বলে আসছে বিশ্বের জেহাদি সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তিস্থল এবং কেন্দ্রবিন্দু পাকিস্তান। কিন্তু পাকিস্তান প্রায় প্রতিদিনই ঘোষণা করে এসেছে পাকিস্তানে ওসামা নেই এবং পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদী ঘটনায় বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্র। তাঁরা একথাও বলেছেন, যে পাকিস্তান নিরন্তর সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে। সৈন্যবাহিনী প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়মমাফিক ঘোষণা করে চলেছিল, পাকিস্তান আন্তরিক ভাবে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্ট্রাটেজিক পার্টনার হিসাবে নিজেদের দায়িত্ব পাকিস্তান সন্তোষজনকভাবে নির্বাহ করে চলেছে।

ভারত বারংবার বলে এসেছে, পাকিস্তানের মুখ এবং মুখোশ আলাদা। সন্ত্রাসবাদের মধ্য দিয়ে তাদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রক্ষা করা এবং দাবী আদায় করার প্রয়াস পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতির অঙ্গ। অনেক রাষ্ট্রই নিজ নিজ রাষ্ট্রীয় স্বার্থে এই তত্ত্ব স্বীকার করতে চায়নি। একদিকে যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতিকে মুখের উপর বলে দিয়েছিল, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছিল তাঁদের কাছে অকাট্য তথ্য প্রমাণ নেই। প্রাক্তন পাকিস্তানি রাষ্ট্রপতি জিয়া-উল-হক ভারতের বিরুদ্ধে ''ছায়াযুদ্ধের'' পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে। যখন প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জয়লাভের আশা নেই, তখন শান্তির বার্তা দেওয়ার পিছনে ছায়াযুদ্ধ পরিচালনা জয়লাভের একমাত্র পথ। তিনি ঘোষণা করেছিলেন 'হাজার ক্ষত সৃষ্টি করে ভারতকে ধীর রক্তক্ষরণের মাধ্যমে নিকেশ করতে হবে'। এই ক্ষতসৃষ্টি করার অস্ত্র হিসাবে বিভিন্ন জেহাদি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীদের অস্ত্র, অর্থ, উপকরণ, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত সাহায্য দিয়ে সীমান্ত পার করিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। যেখানে তারা সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটিয়ে সরকারি কর্মচারী, পুলিশ, সামরিক বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে তুলবে তাদের মনোবল ভেঙে দিতে হবে। সাধারণ মানুষকে বিশেষ করে কাশ্মীরে আঘাত করে, হত্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে তাদের এই অবস্থার জন্য দায়ী ভারতীয় পুলিশ এবং সেনাবাহিনী। দ্বিতীয়ত, ভারতের ভিতরে মুসলিম ধর্মীয় নাগরিকদের মধ্যে পাকিস্তানের প্রতি যাঁরা স্বহৃদয়তা রাখেন তাদের ধর্মীয় জারকে মগজ ধোলাই করে প্রচুর অর্থ দিয়ে ভারতবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে দিতে হবে।

প্রকাশ হয়ে গিয়েছে, মুম্বাইতে ২৬/১১ ঘটনার পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে আই এস আই-এর। পাক-সামরিক বাহিনী তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে, উপকরণ দিয়েছে এবং কর্মরত সামরিক অফিসাররা ওই সন্ত্রাসী দলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্যাটেলাইট ফোন দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে পরিচালনা করেছিল।

অন্যদিকে আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো বাহিনী তালিবানী সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করে রাষ্ট্রপতি হামিদ কারজাই-এর সরকারকে কার্যকরী সরকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস করেছে। কারজাই বলছেন সন্ত্রাসবাদী তালিবানদের লেজটুকু রয়েছে আফগানিস্তানে এবং মাথাটা রয়েছে পাকিস্তানে। অতএব আফগানিস্তানে লেজের উপর আঘাত করে লাভ হবে না, পাকিস্তানে আল কায়েদা এবং আফগান তালিবানীদের যারা এই সন্ত্রাসের মাথা সেখানেই আঘাত করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্রোণ আক্রমণ করে সেই প্রচেষ্টাই করছিল, কিন্তু পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী এবং আই এস আই সেই তালিবানী সন্ত্রাসবাদীদের ব্যবহার করে ভারতীয় দূতাবাস এবং বিভিন্ন সমাজসেবা বিভাগের কর্মীদের যেমন চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ, নির্মাণকার্যে যুক্ত ভারতীয় কর্মীদের উপর হামলা করে চলেছে। কারণ আফগানিস্তানে এমন সরকার চাই যারা সব বিষয়ে পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী থাকবে। বহুদিন ধরে পাকিস্তানের শাসকরা তাঁদের নাগরিকদের বুঝিয়ে এসেছেন মিথ্যাকথার প্রচারের মাধ্যমে যে পাকিস্তান যে কোনও সময়েই ভারতদ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। ভারতই তাদের একমাত্র শত্রু। ভারতের আক্রমণ থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করা পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। সেজন্য যুদ্ধের প্রয়োজনে আফগানিস্তানের ভূখণ্ড ব্যবহার করতেই হবে। এই দুই প্রান্তের স্ট্রাটেজিক স্বার্থে তারা অধিকৃত কাশ্মীর সহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে তালিবান ও জেহাদি সন্ত্রাসবাদী তৈরি করার প্রশিক্ষণ শিবির চালাচ্ছে। আল কায়েদা শক্তিকে পাকিস্তানে আত্মগোপন করে থাকার সুযোগ দিয়েছে। ১ মে আবোতাবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সফল অপারেশন 'জেরোনিমো' সেই সমস্ত তথ্য বিশ্বসমক্ষে উদ্ভাসিত করে দিয়েছে। পাকিস্তান ১৩ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা বিশ্ববাসীকে যে মিথ্যার স্তবকে প্রতারিত করে এসেছিল তা ভেঙে গিয়ে পাকিস্তানের মুখোশ খসে পড়েছে। আসল চেহারাটা প্রকাশ্যে এসেছে। পাকিস্তান সরকার বলতে চেষ্টা করছেন এ বিষয়ে তাঁরা জ্ঞাত ছিলেন না। পাকিস্তানের পক্ষে গোয়েন্দা বিভাগের এক বিরাট বিফলতা। এই অপকর্মের

তির সোজাসুজি পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী অধ্যক্ষ জেনারেল আসফাক কিয়ানি এবং আই এস আই প্রধান জেনারেল সুজা পাসার দিকেই গিয়েছে। তাঁদেরই বদান্যতায় ওসামা বিন লাদেন প্রায় সাত বছর আবোতাবাদ অঞ্চলে তাঁদেরই সুরক্ষায় বসবাস করে দিকে দিকে জেহাদি সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিয়েছে। অপমান হজম করে কিয়ানি সাহেব ভারতকে হুঁসিয়ারি দিয়েছেন, পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে কোনও রাষ্ট্র এমন ঘটনা ঘটাবার প্রয়াস করলে সঙ্গে সঙ্গেই উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া হবে, যার জন্য সমস্ত টার্গেট চিহ্নিত করে মহড়াও করে রাখা হয়েছে। কারণ তিনি খুব ভাল করেই জানেন, ভারত ভূখণ্ডে অপরাধ করে বহু সংখ্যক মানুষ পাকিস্তানে ওই দুই সামরিক কর্তার তত্ত্বাবধানে আরামে রয়েছে এবং সেখান থেকে ভারতবিরোধী কার্যকলাপ সংঘটিত করে চলেছে। ২৬/১১ মুম্বাই হামলার মাথা হাফিজ সঈদ এবং ভারতীয় বিমান আই সি ৮১৪ অপহরণে মুক্তি পাওয়া মৌলানা মাসুদ আজহার পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে খোলাখুলি প্রকাশ্য জনসভায় ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে চলেছে। ভারতীয় সংসদ ভবনে আক্রমণ করার চক্রান্ত করতে সমর্থ হয়েছে। দায়ুদ ইব্রাহিমসহ অন্ততঃ ৫০ জন ভারতীয় অভিযুক্ত পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন নামে আশ্রিত রয়েছে। বহুবার তাদের বৃত্তান্ত পাকিস্তানী সরকারকে দেওয়া হলেও সেই মিথ্যার বেসাতি তারা করে চলেছে, 'এইসব নামের কোনও ব্যক্তি পাকিস্তানে নেই'। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী ও আই এস আই-এর প্রত্যক্ষ সাহায্য থাকায় আন্তর্জাতিক রেড কর্নার এলার্ট থাকা সত্ত্বেও এদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। এমনকি লস্কর-ই-তৈবা, জয়েস-ই-মুহম্মদ, জামাত-উদ্-দাওয়া, হিজবুল মুজাহিদ্দিন এত হিংস্র, শক্তিশালী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হয়ে উঠতে পারত না। এটাও এখন প্রকাশ হয়ে গিয়েছে, মুম্বাইতে ২৬/১১ ঘটনার পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে আই এস আই-এর। পাক-সামরিক বাহিনী তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে, উপকরণ দিয়েছে এবং কর্মরত সামরিক অফিসাররা ওই সন্ত্রাসী দলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্যাটেলাইট ফোন দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে পরিচালনা করেছিল। মার্কিন সরকার দশ বছর যাবৎ নিরন্তর প্রয়াস করে সেই ঘটনার নায়ক ওসামা বিন লাদেনকে শেষ পর্যন্ত খতম করে নিঃশ্বাস নিয়েছে। নিজেদের সুরক্ষা ব্যবস্থা এমনই আঁটোসাটো করে নিয়েছে যে ৯/১১ আর একবার ঘটানো সহজ হবে না। কিন্তু ভারতের পক্ষে তেমন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। জম্মু কাশ্মীর, নেপাল, বাংলাদেশ সীমান্ত এবং উন্মুক্ত উপকূলের যে কোনও স্থান দিয়ে অনুপ্রবেশ কঠিন নয়, বিশেষ করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় শক্তির মদত থাকলে সবই সম্ভব। যেমন খুব সাধারণ স্তরে কাশ্মীরের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে অনুপ্রবেশকারীরা সীমান্ত

এই রহস্যময় ব্যক্তিটির নাম মেজর ইকবাল। হ্যাডলির বক্তব্যের সূত্র ধরে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন 'চৌধুরী খান' নামে পরিচিত আই এস আইয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এই পাকিস্তানী সেনা আধিকারিকই মুম্বাইতে ২৬/১১-র ঘটনার মূল মস্তিষ্ক।

সৈনিকদের আশ্রয়ে থাকে এবং অনুপ্রবেশের সময় ভারতীয় টহলদারী সৈন্যদের চলাচল ব্যাহত করতে সীমান্তের ওই অঞ্চলের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে থাকে।

ভারতের পক্ষে এককভাবে এই রাষ্ট্রীয় জেহাদি সন্ত্রাস দমন করা সম্ভব নয়। কোনও কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই পাক-ভারত সামরিক সংঘর্ষের প্রশ্ন উঠে আসে। সমগ্র বিশ্ব 'গেল গেল' রব তোলে। দুই পরমাণুধর রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে আর একটা পরমাণু যুদ্ধের সম্ভাব্য কেন্দ্রবিন্দু বলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তান অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে এই স্ট্রাটেজি কার্যকর করে চলেছে। ভারতে ছায়াযুদ্ধের মাধ্যমে বড়সড় আঘাত করে। এবং ভারত যখন সামরিক প্রত্যুত্তর দেওয়ার প্রস্তুতি নেয়, তখন সমস্ত বিশ্বকে উদ্দেশ্য করে বলে থাকে 'আমাদের পরমাণু অস্ত্র একমুখী, ভারতের দিকেই টার্গেট করা আছে, ভারত বাড়াবাড়ি করলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে পাকিস্তান দ্বিধা করবে না। সমস্ত বিশ্ব সচকিত। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী সেক্রেটারি অফ স্টেট সবাই ভারতকে উপদেশ দিতে আবির্ভূত হন, কিন্তু সমস্ত বিশ্ব কেন একজোট হয়ে এই সন্ত্রাসবাদের কারখানাকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসাবে অভিহিত করতে চাইছে না, অথবা তাকে হাজার হাজার বিলিয়ন অর্থ, অস্ত্র-বিদ্যাদান বন্ধ করে তার উপর অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ জারি করে তাকে একঘরে করার সাহস করছে না। শুধু কি চীন রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ সমর্থন এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রের স্ট্রাটেজিক স্বার্থ এজন্য দায়ী?

ওসামা হত, পাকিস্তানের মুখোসও অন্তর্হিত। জেহাদি সন্ত্রাসের আঁতুড় ঘর সর্বসমক্ষে পর্দাফাঁস। এখন রাষ্ট্রসঙ্ঘ কি ব্যবস্থা নেয় দেখার অপেক্ষা রইল।

ভারত প্রত্যাঘাতের জন্য তৈরি না হলে বিপন্ন হবে দেশের অস্তিত্ব

সাধন কুমার পাল

নাইন-ইলেভেন। এই শব্দটি বিশ্ববাসীর চোখের সামনে এমন একটি ধ্বংসের ছবি তুলে ধরে, অনুভূতিতে এমন একটি আতঙ্ক সৃষ্টি করে যার কোনও তুলনা নেই। টুইন-টাওয়ার ধ্বংসোত্তর বিধ্বস্ত আতঙ্কিত আমেরিকা সেদিন শপথ নিয়েছিল, যেকোনও মূল্যে এর জবাব দিতে হবে। এরপর প্রায় দশটি বছর কেটেছে। এর মধ্যে আমেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণ, ইরাক আক্রমণের মতো ঘটনা ঘটেছে। এই সমস্ত ঘটনা ঘটানো কতটা উচিত হয়েছে বা উচিত হয়নি সে প্রসঙ্গে না গিয়ে এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, টুইন টাওয়ার ধ্বংসের মূল ষড়যন্ত্রী বিশ্বত্রাস ওসামা বিন লাদেন-কে সুদে আসলে তার কৃতকর্মের ফল পরিশোধ করে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা থেকে যে আমেরিকা একচুল নড়েনি তা প্রমাণিত হলো ওদের ভাষায় অপারেশন 'জেরোনিমো' তে। নাইন ইলেভেন যেমন নজিরবিহীন ঘটনা, তেমনি গভীর রাতে পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশে ঢুকে সে দেশের নিরাপত্তার দিক থেকে স্পর্শকাতর জনবহুল এলাকা আবোতাবাদে আত্মগোপন করে থাকা ওসামা বিন লাদেন-কে খতম করা এবং অবিশ্বাস্য দ্রুততায় তার মৃতদেহ ওজন বেঁধে সমুদ্রে চুবিয়ে মাংসাশী সামুদ্রিক প্রাণীর খোরাক করে তোলারও কোনও নজির মানব সভ্যতার ইতিহাসে আছে বলে মনে হয় না। অর্থাৎ যেমন ঢিল তেমনি পাটকেল। নাইন-ইলেভেনের প্রায় এক দশক পর আক্রমণ প্রতি আক্রমণের এই আপাত ভারসাম্য বিঘ্নিত করার সাহস ইসলামিক জঙ্গীরা দেখাবে কিনা তা ভবিষ্যৎ বলবে। তবে দ্বিতীয়বার আমেরিকা আক্রমণের কথা ভাবলে ইসলামি জঙ্গিদের মনশ্চক্ষে নিশ্চিতভাবে লাদেনের পরিণতির দৃশ্যটি ভেসে উঠবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে করিয়ে দেবে যে এই পৃথিবীর জলস্থল অন্তরীক্ষ কোনও স্থানই আর তাদের জন্য নিরাপদ নয়।

মানবসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিশ্বমানের প্রতিরক্ষা শক্তিতে বলীয়ান একটি দেশ শতশত জঙ্গি আঘাতে হাজার হাজার নিরীহ নাগরিক ও তরতাজা সুরক্ষা কর্মীদের হারিয়েও প্রত্যাঘাতের জন্য রুখে দাঁড়ায় না কেন? এই প্রশ্নের দুটো উত্তর হতে পারে। এক, এদেশের 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম ভোট হারানোর ভয়ে স্বদেশী বিদেশী কোনও ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠী এমনকী পাকিস্তানের মতো সন্ত্রাসবাদী ইসলামিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা, স্বর উচিয়ে কথা বলতে পর্যন্ত ভয় পায়। দুই, যে দেশে শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে বালগোপাল বা গোপিনী পরিবেষ্টিত বংশীধারী কৃষ্ণের কদর বেশি সেই দেশে আঘাত প্রত্যাঘাতের নীতির চেয়ে শত আঘাতেও কারও প্ররোচনার ফাঁদে পা না দিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া বা ধামাচাপা দেওয়া নীতির কদর বেশি হবে এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে?

পাশাপাশি টুয়েন্টিসিক্স-ইলেভেন শব্দটিও বিশ্ববাসীর মনশ্চক্ষে হাড়হিম করা সন্ত্রাস ও নরসংহারের যে ছবি তুলে ধরে সেটিও এক কথায় নজিরবিহীন। ১২১ কোটি জনসংখ্যার একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অর্থনৈতিক রাজধানী মুম্বাই-এর বুকে দাঁড়িয়ে বিদেশী সন্ত্রাসবাসীদের নরসংহারের দৃশ্য দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর মনে জবাবী সংকল্পের স্পৃহা তৈরি করলেও এদেশের নীতি নির্ধারকদের মনে পাল্টা প্রত্যাঘাতের জেদ সৃষ্টি করেনি। প্রত্যাঘাত তো দূরের কথা, সেদিনের ঘটনায় ভারতীয় জওয়ানদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে মৃত নয় জন পাকিস্তানী জঙ্গির পচা গলা লাশ দেশবাসীর পয়সায় চৌদ্দমাস ধরে সংরক্ষণ করে পাকিস্তানের সঙ্গে লাশের রাজনীতি করেছে। ভাবখানা এমন যে এই পচাগলা লাশ যদি একবার তাদের দেশের মানুষের লাশ বলে পাকিস্তানের হাতে ধরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতির 'বিশ্বকাপ'টি ভারতের ঘরে উঠবে। মৃত জঙ্গিদের পচা গলা লাশ নিয়ে যারা এতটা সিদ্ধান্তহীনতা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে, আজমল কাসভ বা আফজল গুরুর মতো জীবন্ত যমদূতদের তারা নানা অজুহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে জামাই আদরে রাখবে এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে। যেখানে আঘাত করলে কোনও রকম প্রত্যাঘাত আসে না সেখানে একটি শিশুও আঘাত করে। প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নিয়মের জন্যই

যে ভারত নিরন্তর জঙ্গি আক্রমণের লক্ষস্থল হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে, মানবসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিশ্বমানের প্রতিরক্ষা শক্তিতে বলীয়ান একটি দেশ শতশত জঙ্গি আঘাতে হাজার হাজার নিরীহ নাগরিক ও তরতাজা সুরক্ষা কর্মীদের হারিয়েও প্রত্যাঘাতের জন্য রুখে দাঁড়ায় না কেন? এই প্রশ্নের দুটো উত্তর হতে পারে।

এক, এদেশের 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম ভোট হারানোর ভয়ে স্বদেশী বিদেশী কোনও ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠী এমনকী পাকিস্তানের মতো সন্ত্রাসবাদী ইসলামিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা, স্বর উচিয়ে কথা বলতে পর্যন্ত ভয় পায়। দুই, যে দেশে শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে বালগোপাল বা গোপিনী পরিবেষ্টিত বংশীধারী কৃষ্ণের কদর বেশি সেই দেশে আঘাত প্রত্যাঘাতের নীতির চেয়ে শত আঘাতেও কারও প্ররোচনার ফাঁদে পা না দিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া বা ধামাচাপা দেওয়া নীতির কদর বেশি হবে এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে?

ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টালে দেখা যাবে দেশের শত্রুদের সঙ্গে এই আপসরফা বা ওদের করুণা ভিক্ষার পরম্পরা শুরু হয়েছে পরাধীন ভারতবর্ষেই। তখন দেশে ইংরেজের শাসন। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে যারাই আপসহীন লড়াই শূন্য সমঝোতার নীতি নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করতে চেয়েছে তাদের নামে নানারকম কুৎসা ছড়িয়ে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা এমন কি ইংরেজের সঙ্গে যৌথভাবে তাদের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে পর্যন্ত সামিল হতে দেখা গেছে সে সময়ের কমিউনিস্ট পার্টি ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে। পরাধীন ভারতবর্ষে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও স্বাধীন ভারতবর্ষে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অন্তিম পরিণতিই এ কথার বড় উদাহারণ। সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদের সঙ্গে শূন্য সমঝোতার নীতিতে বিশ্বাসী অরাজনৈতিক সমাজসেবী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের গায়ে সন্ত্রাসবাদের তকমা লাগানোর বর্তমান প্রয়াস দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে দেশের শত্রুদের সঙ্গে আপস রফার নীতি অনুসরণের ট্রাডিশন এখনও সমানে চলছে। পরাধীন ভারতবর্ষে এই নীতি ভয়াবহ হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন হানি, দেশভাগ, লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্‌বাস্তু হওয়ার মতো পরিণাম ডেকে এনেছিল। আর স্বাধীন ভারতে এই একই পথ সন্ত্রাসবাদ বিচ্ছিন্নতাবাদের মতো উপসর্গ সৃষ্টি করে দেশকে এক চূড়ান্ত ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

লাদেনের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর দেশে দেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে জানাজা আয়োজনের হিড়িক স্যামুয়েল

হ্যান্টিংটনের সভ্যতার সংঘর্ষ তত্ত্বকে আরও একবার জোরালো যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই তত্ত্ব অনুসারে গোটা বিশ্বকে ধর্ম সংস্কৃতির ভিত্তিতে সাতটি সভ্যতায় ভাগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের মাধ্যমে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পর একবিংশ শতাব্দিতে এই বিশ্বে শুরু হবে সভ্যতার লড়াই। উপর উপর দেখলে বর্তমান বিশ্বের চলমান লড়াইগুলোর কারণ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার (যেমন লিবিয়ার উপর ন্যাটো বাহিনীর আক্রমণ), নিষিদ্ধ অস্ত্র থাকা বা তেলের খনি দখল ইরাক আক্রমণ) বা বিশ্বকে সন্ত্রাস মুক্ত করা মনে হলেও হান্টিংটনের মতে এই লড়াই-এর মূলগত কারণ সভ্যতার সংঘর্ষ। ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ইসলামিক জঙ্গিদের ধারাবাহিক আক্রমণ ও লাদেন স্মরণে কাশ্মীরের সৈয়দ আলি শাহ গিলানির উদ্যোগে আয়োজিত জানাজা, খোদ সেন্ট্রাল কলকাতার একটি মসজিদে ধর্মতলার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম মৌলানা নূরুর রহমান ও অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ফোরামের প্রেসিডেন্ট ইদ্রিশ আলি আয়োজিত নমাজ, মৌলানা মহম্মদ নাসিরুদ্দিনের নেতৃত্বে হায়দ্রাবাদের উজালে শা ইদগা ময়দানে আয়োজিত নমাজ বা চেন্নাইয়ের আন্নাসরাই রোডের একটি বড় মসজিদে আয়োজিত নমাজের মতো দেশজোড়া বিশেষ প্রার্থনা সভা আয়োজনের মতো ঘটনা ও এই সমস্ত ঘটনা নিয়ে মুসলিম সমাজের বাকি অংশের মৌনতা কি এদেশেও সভ্যতার সংঘর্ষ ঘটে চলার ইঙ্গিত দেয় না? ইতিহাস বলছে পরাধীন ভারতবর্ষে এদেশের মূল সমাজ থেকে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য বোধের ভাবনা কে দেখেও না দেখার ভান করে, বুঝেও না বুঝার ভান করে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের মতো ঘটনা ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। একবিংশ শতাব্দীর স্বাধীন ভারতবর্ষ যদি ইতিহাসের এই শিক্ষাকে সামনে রেখে সভ্যতার সংঘর্ষ নামক বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে দেশের নীতি নির্ধারণ না করে তাহলে এই শতাব্দীতেই হিন্দু সভ্যতাকে যে চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হবে এ বিষয়ে তেমন কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

বরফমানুষ

অন্য রকম

বরফ-মানুষ উইম হফ হাড় হিম করা ঠাণ্ডায় অক্লেশে বরফের মধ্যে।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যাঁরা জানেন, তাঁরা বরফ-মানুষ বলেই তাঁকে জানেন। বরফের মধ্যে তিনি অক্লেশে হাঁটতে পারেন, ঘুমোতে পারেন, খেতে পারেন, উঠতে পারেন, বসতে পারেন; মায় বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা কনকনে জলে চানও করতে পারেন। এই এত কিছু করা-করির মাঝে ডাক্তারদের কড়াকড়িও স্রেফ ফেল মেরে যাচ্ছে। এটা করো না, ওটা করো না গোছের ডাক্তারী বিধিনিষেধ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার পাশাপাশি নিউমোনিয়া রোগটাকেও ডাক্তারী অভিধান থেকে বিদেয় করে দিয়েছেন তিনি। উইম হফের সম্বন্ধে এতগুলো কথা যত সহজে বলা গেল, ব্যাপারটা অত সহজ নয় মোটেও। যেমন ধরুন সুমেরু প্রদেশে একটি ফুটবল মাঠের মতো দীর্ঘাকৃতি বরফের পুকুর জুড়ে আপনাকে সাঁতরাতে বলা হয় কিংবা শূন্য ডিগ্রীর তাপমাত্রার নিচে খালি পায়ে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে বলা হয়, তবে আপনার অবস্থাটা কি হবে ভাবতে পারছেন? কোনও রক্ত-মাংসের মানুষের পক্ষে এই অস্বাভাবিকস্য অস্বাভাবিক কাজটা করা সম্ভব? শুনেই তো নিউমোনিয়া হবার যোগাড়!

যাক্ গে! উইম হফকে আবার রক্তমাংসের বাইরে অন্য কিছু-মিছু দিয়ে তৈরি মানুষ ভেবে বসবেন না যেন। উইম হফও একজন রক্ত-মাংসের মানুষ। তবে তিনি সাধারণের থেকে একেবারেই 'অন্যরকম'। ইতিপূর্বে ২০০৭ সালে মাউন্ট এভারেস্টের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহন করতে চেয়েছিলেন। স্রেফ হাওয়াই চটি আর হাফ-প্যান্ট পরে। কিন্তু বীভৎস ঠাণ্ডায় দেহ একপ্রকার জমে গিয়ে ৭৪০০ মিটারের বেশি উচ্চতায় আর উঠতে পারেননি তিনি। কিন্তু একে আর যাই বলুন না কেন শুধুমাত্র 'শুকনো চেষ্টা' বলতে পারবেন না। মানুষ তার আপন প্রতিভাবলে কি পরিমাণ অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে সেই নেশায় মেতে উঠলেন হফ। তবে শুধু মেধা দিয়েই নয়, প্রতিভার যথার্থ স্ফূরণ ঘটাতে যোগাভ্যাস শুরু করলেন তিনি। ফলও মিলল হাতে নাতে। অনেকটা তিব্বতী সাধুদের ধাঁচে 'টুম্মো' (Tummo) ধ্যান (Meditation) অনুশীলন করতে শুরু করেন তিনি। তাই আজ সুমেরু বৃত্তের মাইনাস ডিগ্রী তাপমাত্রাতেও বরফের ওপর হাঁটতে একবিন্দু পা টলে না তাঁর, বরফ-জলে চান করতে হি-হি করে কাঁপার প্রয়োজন পড়ে না তাঁর। যেখানকার বিদ্যেয় আজ বাজিমাত করলেন উইম হফ তার থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে তাঁর অবস্থান। সংস্কৃতি যখন ডাল-পালা ছড়ায় কিলোমিটারের দূরত্ব তখন বাঁধা মানে না। সনাতনী ঐতিহ্যের সমাদর প্রাচ্যেও যেমন, পাশ্চাত্যেও। এই কথাটাই নতুন করে প্রমাণ করলেন হফ।

হফের কৃতিত্বটা আরও বেশি। কারণ ডাক্তারী বিদ্যায় কিছু অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন তিনি। ডাক্তাররাও অনেক কিছুই মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন হফের পাল্লায় পড়ে। জনৈক সুহৃদের কথাটা প্রণিধানযোগ্য—'আরে চরক কিংবা সুশ্রুতের দেশের বিদ্যে সফল হবে না তো কার হবে? গুরুমারা বিদ্যেয় কিছুদিন চলে, কোনও জাতির (পড়ুন পাশ্চাত্য দেশে) সারাজীবন চলে না।"

নিরীশ্বরবাদীদের নৃত্য আর হিন্দুর দুঃখের বৃত্ত

শৌর্যধ্বজ সৌকালিন ঘোষ

স্বাধীনতার পর ৬৪ বছর অতিক্রান্ত, দেশের রাজনীতি আজ মূলতঃ পশ্চিমী উদারবাদী ও রাষ্ট্রবাদী শক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আঞ্চলিক দলগুলি কখনও পশ্চিমী উদারবাদী দলগুলি আবার কখনও রাষ্ট্রবাদী শক্তির সঙ্গে জোট করে কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আবির্ভূত হচ্ছে। মুসলমান প্রীতির নিদর্শন হিসাবে। যেখানে স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশের রাজধানী হবার কথা এলাহাবাদের। নামও পরিবর্তন করে সনাতনী নামে ফেরানোও জরুরী ছিল। যা হলো প্রয়াগ। কিন্তু বাস্তবে হলো কী মুসলমান প্রভাবান্বিত লক্ষ্ণৌ হলো রাজধানী। এলাহাবাদের নামও অপরিবর্তিত রইল। সে পেল শুধু হাইকোর্ট। একই অবস্থা হলো দেশের আর এক বৃহৎ রাজ্য অবিভক্ত মধ্যপ্রদেশে। রাজধানী হবার কথা ছিল জব্বলপুরে। কিন্তু তাকে হাইকোর্ট দিয়ে আবারও মুসলমান প্রভাবিত ভোপাল হলো রাজধানী। দিল্লী হলো না ইন্দ্রপ্রস্থ। মুসলমানী নাম থেকে গেল দেশভাগের পরও। ক্যালকাটা হলো কলকাতা। ফিরছিই যখন এখন কালীক্ষেত্র বা কালীতীর্থে ফিরতে দোষ কোথায়? বন্দেমাতরম্ হলো জাতীয় সংগীত কিন্তু National Anthem নয় কেন? মুসলমানেরা রাগ করবে তাই?

বন্দেমাতরম্ সম্পূর্ণ গানটাও গাওয়া যাবে না। পৌত্তলিকতায় আছে মুসলমানী বাধা, দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা যে বন্দেমাতরমে শিহরিত হয়ে দেশমাতৃকার সেবায় প্রাণদান করল, স্বাধীন দেশে দেশভাগের পর যখন ২৪ শতাংশ মুসলমান ২৪ শতাংশ অখণ্ড ভারতের জমি নিয়ে আলাদা হয়ে গেল, আমাদের নিরীশ্বরবাদী নেতৃত্ব তার অন্তর্নিহিত হিন্দু বিদ্বেষ থেকে বেরতে চাইল না। সিন্ধু সাগর রয়ে গেল আরবসাগর, গঙ্গাসাগরের জায়গায় বঙ্গোপসাগর অপরিবর্তিত থাকল, হিন্দুসাগর ভারত মহাসাগর হয়েই রইল। কিন্তু হিন্দুত্বের ভূত নিরীশ্বরবাদীদের কেবলই তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ স্বধর্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্ম সমন্বয়ের সাধক ছিলেন। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্বধর্ম পরিত্যাগ করেছিলেন তাই দয়ার ঠাকুরও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেননি। ধর্মনিরপেক্ষতা যদিও সর্বধর্মসমভাবকে বোঝায় কিন্তু ভারতবর্ষের প্রভাবশালী নীতিনির্ধারকরা অনেকেই নিরীশ্বরবাদী ও স্বধর্মবিদ্বেষী। ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে নিরীশ্বরবাদের প্রচার চলছে সূক্ষ্মভাবে। পশ্চিমী উদারবাদের গুণমুগ্ধ ও পশ্চিমী সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী শক্তিগুলির এক সাধারণ অক্ষরেখা রয়েছে নিরীশ্বরবাদ। যদিও ভারতবর্ষের শিক্ষায় সমাজতান্ত্রিক হতে গেলে নিরীশ্বরবাদী হতে হবে এ বাধ্যবাধকতা নেই। সুভাষচন্দ্র বসু সমাজতান্ত্রিক ছিলেন। নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। স্বামী বিবেকানন্দও সমাজতান্ত্রিক ছিলেন তবে তা Vedantic Socialism যার প্রেরণা বেদান্তে। বিশ্বের অনেক সেন্সাসে নিরীশ্বরবাদীদের আলাদা করে দেখানো হয়। কোনও কোনও সেন্সাসের মতে বিশ্বের ১৯ শতাংশ মানুষ নিরীশ্বরবাদী। স্বাধীনতা উত্তরকালে ৬৪ বছরের মধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্যে প্রথম ৪৪ বছর নিরীশ্বরবাদীদের নিরবচ্ছিন্ন রাজত্ব ছিল। কেন্দ্রে তো প্রায় ৫৮ বছর তাঁদের রাজত্ব। ফলে ১৯৪৭ উত্তর নব্য ধনী শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছে তাঁরা নিরীশ্বরবাদীদের স্নেহধন্য। ফলে তাঁদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই ওই মূল আদর্শটি খুব দৃঢ়ভাবে গভীরে গ্রথিত। প্রভাবশালী প্রচার মাধ্যমগুলিও নিরীশ্বরবাদী রাজশক্তির প্রসাদে পল্লবিত হয়েছে তাই তাঁরাও নিরীশ্বরবাদের প্রতি স্নেহভাবে আবদ্ধ। গভীরে হিন্দুবিরোধীও। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিতে সুদীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকার ফলে নিরীশ্বরবাদীরা সকল সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত গবেষণা কেন্দ্রগুলিকে নিরীশ্বরবাদের তত্ত্বে প্রভাবিত করে ফেলেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন সেখানে নিরীশ্বরবাদীদের প্রবল প্রভাব রয়েছে। নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস চর্চার চেষ্টা হয়নি। আজকাল তো ঐতিহাসিকের নাম দেখলেই বোঝা যায় তিনি কোন মতের পক্ষে কলম ধরেছেন। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের পর সৎভাবে নিরপেক্ষতা নিয়ে ইতিহাস চর্চা প্রায় বিরল। সবটাই গুলিয়ে দিয়ে হিন্দু জাতিকে তলিয়ে দেবার চেষ্টা।

বাংলাভাষাভাষী মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার সময় ৪৬ শতাংশ ছিল হিন্দু আজ প্রায় ৩৩ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় ১৩ শতাংশ হিন্দু বাঙ্গালী হারিয়ে গেছে। মানে প্রায় ১৫ কোটি বাংলাদেশী বাঙ্গালী ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৮ কোটি বাঙ্গালী মিলে আজ বিশ্বে বাংলাভাষাভাষী মানুষ প্রায় ২৩ কোটি। সেখানে স্বাধীনতার সময়কার হিন্দু- মুসলমান অনুপাতও বজায় থাকলে হিন্দু বাঙ্গালীর সংখ্যা থাকা উচিত ছিল ২৩ কোটির ৪৬ শতাংশ অর্থাৎ ১০½ কোটির মতো। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, ভারতের অন্যান্যরাজ্য ও বহির্বিশ্ব মিলে হিন্দু বাঙ্গালীর সংখ্যা আজ ৮ কোটিতেও পৌঁছাবে না। অর্থাৎ ২½ কোটি বাঙ্গালী হিন্দু হারিয়ে গেছে ৬৪ বছরে।

Macaulay সাহেব চেয়েছিলেন বাদামি সাহেবের আবির্ভাব। যাঁরা ভারতীয় রক্তের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও মন ও চিন্তাকে পশ্চিমের কাছাকাছি রাখবে। আজ তিনি জীবিত থাকলে দেখতেন আংশিকভাবে তিনি সফল। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় ভারতবর্ষকে চিনেছে সাহেবদের চোখে। সাহেবী বই পড়ে। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের আলোকে নয়। এমনকি বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের ভারত দর্শন পড়েও নয়। দুঃখের বেদনার কিন্তু সত্য হলো গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর হিন্দুর হাত থেকে যে রাজশক্তি বিধর্মী শাসকের হাতে চলে গিয়েছিল তা আজও হিন্দুর অধরা। সুদীর্ঘকাল তুর্কি-মোগল-পাঠানের হাতে নিষ্পেষিত হবার পরও বৃটিশ শক্তির কাছে দলিত হবার শেষে এখন নিরীশ্বরবাদীদের শাসনকাল। তাই যখন পশ্চিমবঙ্গের একের পর এক জেলায় হিন্দু তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাচ্ছে যা

পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র সামাজিক পটপরিবর্তনের বার্তা বহন করে আনছে এক নির্দয় সত্য। নিরীশ্বরবাদীরা নির্লিপ্ত। মুর্শিদাবাদ স্বাধীনতার পূর্বেও মুসলমান গরিষ্ঠ জেলা ছিল। ২০১১-এ উত্তর দিনাজপুরেও হিন্দু সংখ্যালঘু হয়ে যাবে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ স্বাধীনতার পর ৬৪ বছরের মধ্যে তিনটি জেলায় হিন্দু সংখ্যালঘু হয়ে গেল। এরপর উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার পালা কারণ সেখানে ৩০ বছরের নীচে অল্পবয়সী মুসলমান যুবকের সংখ্যা বয়স্ক মুসলমান ব্যক্তির চেয়ে বেশি। বীরভূমে মুসলমানরা জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ।

বিমল প্রামাণিকের "Endangered Demography : Nature And Impact Of Demographic Changes In West Bengal 1951-2001" পড়লেই এ সত্য সহজেই বোঝা যাবে। ডঃ দীপক বসুর "Hindus Under Muslim Rule In West Bengal" বইটিও প্রণিধানযোগ্য। আমেরিকার State University of Newyork, Oldwestbury-র অধ্যাপক সব্যসাচী ঘোষদস্তিদার মহাশয়েরও এই বিষয় প্রচুর গবেষণাধর্মী কাজ করেছেন। এগুলি পড়লেই বিপদের কারণ সামনে ভেসে উঠবে আমাদের নির্লিপ্ততা আমাদের নিজভূমে পরবাসী করে দেবে অদূর ভবিষ্যতেই তখন রোদনেও রদ করতে পারবে না বিপদের সে বিভীষিকা। পাকিস্তানের বিপদ সম্পর্কে আমরা সচেতন কিন্তু বাংলাদেশের বিপদ নিয়ে প্রায় অচেতন। কিন্তু অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের রাজ্যপাল মহাশয়রা একাধিকবার কেন্দ্রকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ নিয়ে সতর্ক করে রিপোর্ট পাঠানো সত্ত্বেও কেন্দ্র রাজনৈতিক কারণে তাকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়নি। ঐতিহাসিক ভাবে হিন্দু তার গরিষ্ঠতা হারিয়েছে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে। এক তৃতীয়াংশ কাশ্মীরও পাকিস্তানের দখলকৃত, হিন্দু গরিষ্ঠতা হারিয়েছে কাশ্মীরও। এবার পূর্ব ও উত্তরপূর্ব ভারতে থাবা বসাতে তৈরি হচ্ছে ঐসলামিক শক্তি। সাধু সাবধান। নচেৎ শিয়রে সমন নিয়ে এগিয়ে আসছে, ভয়াবহ দিন। পরিত্রাণের মন্ত্র জানা নেই নিরীশ্বরবাদীদের। অবশ্য তাঁদের যে ইচ্ছাও নেই। তাই রাষ্ট্রবাদী শক্তিই ভরসা। শ্যামাপ্রসাদ দেখতে পেয়েছিলেন এই ভয়াবহ বিপদকে। আমরাই বুঝতে পারিনি তাঁর দর্শনকে।

মুসলমান সমাজ ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলবে যেখানে তাঁরা সংখ্যালঘু যে দেশে তাঁরা সংখ্যাগুরু সেখানে তাঁরা ঐসলামিক শাসনের কথাই বলে এসেছে। বিপ্রদাস ভট্টাচার্যের 'ইসলামিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা কেমন আছেন?' বইটিতে একথা বিশদ ব্যাখ্যা করা রয়েছে। "The Vested Property Act" করে বাংলাদেশে হিন্দুর সম্পত্তি দখল চলেছে অবিচ্ছিন্নভাবে। সুফি মুখোশের আড়ালে তালিবানি মুখের প্রকাশ দেখেছে হিন্দু বারে বারে। দলে দলে হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়েছে কখনও সুফি মুখ দেখে, কখনও হিন্দী সিনেমায় মুসলমান নায়কের রূপ দেখে আর ঐতিহাসিকভাবে মুসলমান রাজশক্তির বর্বরতায় বাধ্য হয়ে। পাকিস্তানে, বাংলাদেশের সিনেমায় হিন্দু নায়ক মুসলমান নায়িকা ভাবা যায়? কিন্তু ভারতে সেটাই জল চল। হিন্দু সমাজে মুসলমান জামাতার ভাবটা যাতে কালক্রমে জাঁকিয়ে বসে। হিন্দু পরিবার যাতে ভেঙ্গে যায়, সংস্কার পরিবর্তিত হয় ধর্মান্তরণ প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হয়।

বাংলাদেশে হিন্দু সম্পত্তি লুঠ হয়েছে—এ অসভ্যতা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানকে দেখতে হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সম্পত্তি সুরক্ষিত ছিল আছে, থাকবেও। সেটা হিন্দুর ভদ্রতা। বাংলাদেশে হিন্দু সম্পত্তি বিক্রি করলে দাম পাওয়া যায় না। যা সহজেই দখল করে নেবে মুসলমান বাহিনী তার দাম দেবে কেন? ভারতে উদ্বাস্তু হয়ে যেতে গেলে ভিখারী হয়ে যাও। আর দেশে থাকতে হলে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো থাকো। না হলে ধর্মান্তরিত হয়ে সম্মান সম্পত্তি বাঁচিয়ে নাও। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সম্পত্তি বিক্রি করে বাজার দরেই। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের জন্য সংরক্ষণ, সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর, মুসলমান ছাত্রের জন্য বৃত্তি অর্থসাহায্য। পূর্ববঙ্গে হিন্দুর অবস্থা নিয়ে নিরীশ্বরবাদীরা নির্বাক, নিশ্চুপ। অনুপ্রবেশ নিয়ে নির্লিপ্ত নিরীশ্বরবাদীরা অনেক সময় প্রশ্রয়দানকারী। বাংলাদেশে সরকার বিমাতৃসুলভ আচরণ করে লিখিত পরীক্ষায় ২৫ শতাংশ হিন্দু পাশ করলে মৌখিক পরীক্ষায় পাশ করে ২-৩ শতাংশ। আর এক ভোট নষ্টের তত্ত্ব আছে পশ্চিমবঙ্গে। এই অলীক তত্ত্ব ভঙ্গ বঙ্গকে ভঙ্গুর করছে ভিতর থেকে। গণতন্ত্রে নিজের প্রথম পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়াই রীতি। তাতে যে জিততে পারে হারাতেও পারে। হারলেও শতাংশের বিচারে উক্ত দলের জনসমর্থনের ভিত্তিটি বোঝা যায়। পরবর্তীকালের নীতিনির্ধারণের সময় সেই শতাংশের বিচারে এগিয়ে আসা শক্তি ক্রমশ সাহস সঞ্চয় করে প্রান্তিক থেকে প্রধান হয়ে ওঠার পথে এগিয়ে যেতে থাকে।

বাংলাভাষাভাষী মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার সময় ৪৬ শতাংশ ছিল হিন্দু আজ প্রায় ৩৩ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় ১৩ শতাংশ হিন্দু বাঙ্গালী হারিয়ে গেছে। মানে প্রায় ১৫ কোটি বাংলাদেশী বাঙ্গালী ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৮ কোটি বাঙ্গালী মিলে আজ বিশ্বে বাংলাভাষাভাষী মানুষ প্রায় ২৩ কোটি। সেখানে স্বাধীনতার সময়কার হিন্দু-মুসলমান অনুপাতও বজায় থাকলে হিন্দু বাঙ্গালীর সংখ্যা থাকা উচিত ছিল ২৩ কোটির ৪৬ শতাংশ অর্থাৎ ১০^{১}-$_{২}$ কোটির মতো। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, ভারতের অন্যান্যরাজ্য ও বহির্বিশ্ব মিলে হিন্দু বাঙ্গালীর সংখ্যা আজ ৮ কোটিতেও পৌঁছাবে না। অর্থাৎ ২^{১}-$_{২}$ কোটি বাঙ্গালী হিন্দু হারিয়ে গেছে ৬৪ বছরে। বিশ্বে অনেক রাষ্ট্র আছে যার জনসংখ্যাই ২^{১}-$_{২}$ কোটির অনেক কম। আর এই ৮ কোটি থেকে নিরীশ্বরবাদী হিন্দু বাদ দিলে সংখ্যাটা ভয়াবহ। বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় ১৯৭৪ থেকে ১৯৮১-এর মধ্যে হিন্দু জনসংখ্যা কমেছে ৫৫ হাজার। ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ ৭০ হাজার হিন্দু হারিয়ে গেছে চিরতরে। সালাম আজাদ তাঁর বই ''হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশত্যাগ করছে'' -এ বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। তাই দু-চারটে দুর্গাপূজার ছবি দেখিয়ে আর জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রার ছবি ছেপে পশ্চিমবঙ্গের নিরীশ্বরবাদী গণমাধ্যম বাংলাদেশের এই কলঙ্ককে এই সত্যকে চেপে যেতে চায় কেন? কলকাতার বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীরা চুপচাপ থাকেন কোন কারণে? প্রথমত, এ বিষয়ে তাঁদের মনের টান নেই। আর দ্বিতীয়ত, ইউরো, ডলার আর পেট্রোডলার তার উপর সরকারি অনুদান আপ্লুত তথাকথিত স্বাধীনতা উত্তর স্বনামধন্য হিন্দু বাঙ্গালী গুণীজন হিন্দুর দুঃখ কষ্ট নিয়ে মনোযোগ দেবার সময় পাননি। পাছে নিজের ঋদ্ধির সাধনায় বাধা আসে তাই বাংলাভাষাভাষী মানুষের মধ্যে হিন্দুর প্রান্তিক অবস্থা নিয়ে লেখার দিকে নজর দেননি তাঁরা। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে কখনও সাম্প্রদায়িক কখনও অশ্রাব্য ভাষায় কটূক্তি করে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে জিজ্ঞাসুকে। কারণ নিরীশ্বরবাদীরা জানেন পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান গরিষ্ঠ হলে তাঁরা মুসলমান হয়ে যাবেন নির্বিকারভাবে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু থেকে মুসলমান হয়ে হিন্দু এলাকায় ভোটে দাঁড়িয়ে জেতার নিদর্শন তো আছেই। তাও আবার উদ্বাস্তু অধ্যুষিত কেন্দ্রে। কারণ নিরীশ্বরবাদের প্রভাব। বাংলাদেশে মুসলমান থেকে হিন্দু হয়ে মুসলমান কেন্দ্রে ভোটে দাঁড়ানোর কথা ভাবা যায় কি? নিরীশ্বরবাদীদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি হলেই হলো, হিন্দুর কি হলো তাতে কি এসে যায়। বিবেকানন্দ বলেছিলেন ''হাজার বছরের নানা রকম হাঙ্গামায় জাতটা ম'লো না কেন? আমাদের রীতিনীতি যদি এত খারাপ, তো আমরা ততদিন উৎসন্নে গেলাম না কেন? বিদেশী বিজেতাদের চেষ্টার ত্রুটি কি হয়েছে? তবে সব হিন্দু মরে লোপাট হলো না কেন—অন্যান্য অসভ্য দেশে যা হয়েছে? ...ওই বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন, এ দেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন? তোমাদের দু-চারজনের জন্য দেশশুদ্ধ লোককে হাড় জ্বালাতন হতে হবে বুঝি? চরে খাওগে না কেন? এত বড় দুনিয়াটা তো রয়েছে। তা নয়। মুরদ কোথায়? ওই বুড়ো শিবের অন্ন খাবেন, আর নিমকহারামি করবেন...'' নিরীশ্বরবাদীরা হিন্দুকে শেষ করতে পারবে না যদি না হিন্দু তাঁর অতীতকে ভুলতে চায়। রাষ্ট্রবাদী শক্তিকে এগিয়ে দিতে হবে, স্বধর্ম রক্ষার্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে আত্মায় ভগবানকে স্মরণ করে শাস্ত্রের পথে ধর্মের রথে উঠতে হবে।

মুঘল-পাঠান-ইংরাজ আমাদের শেষ করতে পারেনি নিরীশ্বরবাদীরা দিবাস্বপ্ন দেখছে মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে শিবমন্ত্রে দীক্ষা প্রয়োজন।

‘শিশু-কন্যাদের রক্ষা করো’ দাবি উঠেছে মহারাষ্ট্রের গ্রামে

অন্য ছবি দেখা গেলো মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলায়। সেখানকার একটি গ্রামের মানুষ একজোট হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিশুকন্যা রক্ষার। এবং তারা জোরালোভাবে দাবি জানিয়েছে ‘বন্ধ করো গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষা’। গ্রামটার নাম চিখালি। আহমেদনগর শহর থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ‘ভ্রূণহত্যা মহাপাপ’ বলা হোত একসময়। পরে অনেকরকম কারণে গর্ভপাত বা ভ্রূণহত্যা আইনসিদ্ধ হয়। সমাজের নানারকম আলো-আঁধারি খেলায় বা অন্যান্য কারণে অনেক অবিবাহিতা কিশোরী যুবতী অবাঞ্ছিতভাবে সন্তানসম্ভবা হলে ভয়ঙ্কর সঙ্কটের মধ্যে পড়তেন বাবা-মা। কন্যার দরুন তাঁরা সামাজিক এবং পারিবারিক স্তরে বিভিন্ন ধরনের লাঞ্ছনা ভোগ করতেন। তাঁরা গোপনে হাতুড়ে ডাক্তার বদ্যি বা গ্রামের কোনও মহিলার সাহায্যে সবকিছু স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালাতেন। তাতে অনেক সময়ে মেয়েটির মৃত্যু হোত। অনেক মেয়ে আর কখনও মাতৃত্ব লাভ করতে পারবে না—এমন ব্যাপারও ঘটত। অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে রেহাই পাওয়া কন্যার স্বাভাবিকভাবে বিয়ে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ত। কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে মানসিক সামাজিক পারিবারিক সঙ্কটে পড়া মেয়েটি আত্মহননের পথ বেছে নিত। অনেক সময় পারিবারিক মর্যাদা বজায় রাখতে মেয়েটাকে খুন করা হোত কোনও প্রমাণ না রেখে।

এখন গর্ভপাত আইনসিদ্ধ। গর্ভসঞ্চার রোধের নানারকম ব্যবস্থাও আছে। প্রজাভারে পীড়িত দেশে নির্বিচার জন্মদান নিষ্ঠুর পাপ—একথা এক বিশেষ শ্রেণীর ভারতবাসী বুঝতে চাইছেন না। তাঁরা ক্রমাগত সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের জনসংখ্যা বাড়িয়ে তুলছেন। সেইসঙ্গে পারিবারিক স্তরে দারিদ্র্য এবং অন্যান্য সঙ্কটকে ডেকে আনছেন। পাশাপাশি দেখি ভ্রূণহত্যা আইনসিদ্ধ হওয়ার দরুন সেই আইনের সুবিধে নিয়ে দেশের প্রায় সব জায়গায় গর্ভিনী নারীদের পরীক্ষার ব্যবসা বেশ জোরদার চলেছে। নতুন জীবনের অঙ্কুর নারীর গর্ভে দেখা দেওয়ার পরই উপযুক্ত দক্ষিণায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানা যায়, গর্ভস্থ ভ্রূণ কন্যা না পুত্রের।

দেশে এখন নারী পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত। মেয়েদের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে গর্ভস্থ শিশু কন্যা না পুত্র এই পরীক্ষার পর কন্যা সন্তান চাইছেন না ভারতের গ্রাম ও শহরের অনেক নারী। কন্যাভ্রূণ হত্যা কয়েকটি প্রদেশে ব্যাপকভাবে হচ্ছে। এবং তার পিছনে মেয়েদের সমর্থন রয়েছে। দেশের বেশ কটি রাজ্যে ব্যাপকভাবে কন্যাভ্রূণ সাফাই-পর্ব চলেছে। যা দেখেশুনে আশঙ্কা জাগে আগামীদিনে নারীপুরুষ মাত্রায় বিপজ্জনকরকম তারতম্য দেখা দেবে।

এরকম অবস্থার মধ্যে অন্য ছবি দেখা গেলো মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলায়। সেখানকার একটি গ্রামের মানুষ একজোট হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিশুকন্যা রক্ষার। এবং তারা জোরালোভাবে দাবি জানিয়েছে ‘বন্ধ করো গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গ নির্ণয় পরীক্ষা’। গ্রামটার নাম চিখালি। আহমেদনগর শহর থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে। গ্রামের মানুষ শুধু মুখে বলছে না, তারা পতাকা আর ব্যানার নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে বলেছে, ‘শিশু কন্যাদের বাঁচাও’। গ্রাম থেকে শিশুকন্যাদের আগাছার মতো উপড়ে ফেলার যে মতলব কিছু মানুষ ঢোকাতে চাইছে তার বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষ একজোট হয়েছে। গ্রামবাসীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিছুকাল আগে। সেখানকার পঞ্চায়েত প্রধান বলেছে, প্রথমে দেখা হবে পঞ্চায়েত সদস্যদের। তারা যদি এই নীতির বিপক্ষে যায় তাহলে তাদের কঠোর শাস্তি মিলবে। এখনও কোনও আইন অমান্যের ঘটনা ঘটেনি।

শকুন্তলা দেশমুখ নামে এক সদস্যা গ্রামে গ্রামে যাচ্ছেন নিয়মিত। প্রত্যেকটি পরিবারে শিশুজন্মের ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, সকলেই পঞ্চায়েতের নির্দেশ মানছে। বলা হচ্ছে এর ফলে নারীপুরুষের অনুপাতের ক্ষেত্রে বড়রকম পরিবর্তন ঘটবে। ওই অঞ্চলে প্রতি হাজার পুরুষ পিছু ছিল ৮৯০ জন নারী। গ্রামের তরুণরা এই প্রচারে অংশ নিচ্ছে। বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে খবর নিচ্ছে তারা। ০-৬ বছরের শিশুদের খবর যাতে সরকারি নথিভুক্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখছে। গর্ভবতী নারীদের সঙ্গে কথা বলছে। গ্রামবাসীদের বোঝাচ্ছে। গ্রামবাসীর এই সচেতনতার মূলে রয়েছে স্নেহাঙ্কুর নামে এক স্থানীয় এন জি ও। অনন্ত জিন্দে নামে এক অধ্যাপক ও আন্দোলক সমস্ত আন্দোলনকে সংগঠিত করছেন। গ্রামের মানুষকে ঠিক ভাবে বোঝানোর ফলে সাফল্য মিলছে। গ্রামবাসী শিশু কন্যা রক্ষার দায়িত্ব বুঝতে পারছে।

চিখালি গ্রাম থেকে এই শিশুকন্যা বাঁচানোর অঙ্গীকার ছড়িয়ে পড়ছে অন্যান্য গ্রামে। আন্দোলক গ্রামবাসীরা অন্য গ্রামে গিয়ে বলছে। স্নেহাঙ্কুর সংস্থার প্রধান প্রজাক্তা কুলকার্নি ও অজয় ওয়াবেল আশপাশের গ্রামে গিয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে উদ্যোগ নিয়েছেন। চলচ্চিত্র, স্লাইড ও কাগজপত্র প্রদর্শনের সঙ্গে বক্তৃতা চলেছে। সচেতন হচ্ছেন গ্রামবাসী এই ব্যাপারে। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরাও। গ্রামীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ডাঃ নীতিন খামকার বলেছেন, ‘গ্রামবাসীর মানসিকতার ক্ষেত্রে একটা বদল যে ঘটেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। সরকারি কোনও পরিকল্পনার মাধ্যমে যা সম্ভব হোত না। এমন মহৎ উদ্যোগে অন্যান্য গ্রামের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সাড়া মিলবে আশা করা যায়। আমরা গ্রামবাসীদের পরামর্শ দেওয়ার জন্যে সবসময় তৈরি।’

পঞ্চায়েত প্রধান মাচিন্দ্র জিন্দে আশা করেন আগামী আদমসুমারিতে চিখালি গ্রামের নারী পুরুষের হিসেবে তারতম্য থাকবে না।

দাউদ, আমেরিকা ও ভারত

লাদেন নিহত। কিন্তু পাকিস্তানে এখনও অন্তত এক ডজন আল কায়দা শীর্ষনেতা আছে বলে খবর। আল কায়দার সেকেন্ড কমান্ডার-ইন-চিফ আয়মান আল জাওয়াহিরি সম্ভবত এখন পাকিস্তানে। এছাড়াও রয়েছে, তেহরিক-ই-তালিবান, হাক্কানি গোষ্ঠী, লস্কর-ই-তৈবা, জয়েশ-ই-মহম্মদের মতো জঙ্গি সংগঠনগুলির প্রশিক্ষিত জঙ্গি ও তাদের জন্মদাতা শীর্ষ নেতৃত্ব। মুম্বাইতে ২৬/১১ কাণ্ডের মূলপাণ্ডা হাফিজ সঈদ বহাল তবিয়তে রয়েছে পাকিস্তানে। সে লাদেনের মৃত্যুতে লাদেনের পক্ষে মিটিং-মিছিল করে বেড়াচ্ছে। মিছিল হচ্ছে কাশ্মীর ও বাংলাদেশেও। আমেরিকা বলেছে, লাদেনকে যে ধাঁচে খতম করা হয়েছে অন্য জঙ্গি নেতাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা চায় মার্কিন সেনা। একথা যদি সত্যি হয় তবে লাদেনের মৃত্যুর পর বিশ্বের 'মোস্ট ওয়ান্টেড' তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসা দাউদ ইব্রাহিমও খতম যোগ্য। ১৯৯৩ সালে মুম্বাইয়ে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ কাণ্ডে অভিযুক্ত দাউদকে বহুদিন ধরে খুঁজছে ভারত। মুম্বাই বিস্ফোরণে সহস্রাধিক মানুষ হয়েছেন হতাহত। ওই ঘটনার পর রাতারাতি দাউদ তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে তৎকালীন সরকারও প্রশাসনের সহযোগিতায় পালিয়ে যেতে সমর্থ হয় পাকিস্তানে। সেই থেকে দাউদ ও তার পার্শ্বচর ছোটা শাকিল, টাইগার মেমন পাক সরকার ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির আতিথ্য ও প্রশ্রয়ে দিব্যি পাকিস্তানেই আছে, অবশ্য নাম ভাঁড়িয়ে। দাউদের ডি-কোম্পানি ভারত, পাকিস্তান এবং বিভিন্ন আরবরাষ্ট্রে ৫ হাজারেরও বেশি নেটওয়ার্ক চালাচ্ছে। মুম্বাইয়ের রূপালি তথা অন্ধকার জগতের মাফিয়া ডন শুধু মুম্বাই বিস্ফোরণের জন্যই কুখ্যাত নয়, সে চোরাচালান, মাদক পাচার, তোলাবাজি এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গেও জড়িত। আল কায়দা ও লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে রয়েছে তার গভীর সম্পর্ক। ২০০৮-এর ২৬/১১ কাণ্ডের সঙ্গেও সে যুক্ত। ভারত বারবার পাকিস্তানের কাছে তার প্রত্যর্পণ চেয়েও পায়নি। প্রতিবার লাদেনের ন্যায় দাউদও পাকিস্তানে নেই বলে পাকিস্তান জানিয়ে আসছে। কিন্তু দাউদ যে পাকিস্তানের করাচির ক্লিফটনের সুরক্ষিত বাংলোতে রয়েছে সে কথাও ভারত বারবার পাকিস্তানকে বলে আসছে। তবে তার বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড কর্নার অ্যালার্ট জারি রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, লাদেনকে খতম করতে আমেরিকা কম্যান্ডো হানা চালালেও দাউদ খতমে আমেরিকা সেই পথে হাঁটবে কিনা? উত্তর একটাই, না। কারণ আমেরিকা নিজের স্বার্থ ভিন্ন অন্যের স্বার্থ দেখে না। লাদেন আমেরিকার গায়ে হাত তুলেছে, তাই লাদেনের অনুগামীদের সে যে কোনও মূল্যে নিকেশ করতে পারে। কিন্তু দাউদ দিয়েছে ভারতের গায়ে হাত, তাই দাউদ খতমের ব্যাপারে তার কোনও মাথাব্যথা নেই। জয়েশ, লস্কর প্রভৃতির নেতাদের ব্যাপারেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। দাউদ খতমে ভারত মার্কিন ধাঁচে পাকিস্তানে কম্যান্ডো হানা চালাক— আমেরিকা তারও বিরোধী। আমেরিকা চায়, ভারতে সন্ত্রাসের আগুন জ্বলতে থাকুক এবং পাকিস্তান তাতে ধুনা দিক। কারণ আমেরিকাও চায় না ভারতের শান্তি।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

চীন ও সিপিএম

বর্তমানে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেয় কমিউনিস্ট পার্টি। আবার কমিউনিস্ট পার্টিদের নেতৃত্ব দেয় সিপিএম পার্টি। এটা কম বেশি প্রতিটি দেশভক্ত নাগরিক মাত্রই অবগত আছেন। কমিউনিস্ট শাসনে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের উক্ত বিষয়ে বিশেষ ভাবে অবগত। কমিউনিস্টরা বিশেষ করে রাষ্ট্রপ্রেমী সংগঠন ও রাষ্ট্রভক্তদেরকে চরম শত্রু বলে মনে করে এবং এদেরকে যেন তেন প্রকারে ধ্বংস করে দিতে চায়। রাষ্ট্রদ্রোহী শক্তিগুলি এদের কাছে পরম মিত্র ও আপনজন। যেমন, প্রায় ছয় থেকে আট মাস আগে ভারতবর্ষে বিভিন্ন দেশের পরমাণু বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে এক বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে চীনের—ভারত বিরোধিতার কারণে, চীনের পরমাণু বৈজ্ঞানিকদের আমন্ত্রণ জানান হয়নি এবং ভিসা ও দেওয়া হয়নি। যদিও চীন ও চীনের পরমাণু বিজ্ঞানীরা উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহী ছিল। তারা ভারত সরকারকে এই বিষয়ে বার বার অনুরোধও করেছিল পুনর্বিবেচনা করার জন্য। কিন্তু তাতে কোনও কাজ না হওয়ায়, তাদের পরম মিত্র সিপিএম চীনের হয়ে আসরে নামে। যাতে চীনের পরমাণু বিজ্ঞানীরা, ভারতের উক্ত সম্মেলনে যোগ দিতে সুযোগ পায়, তার জন্য বার বার ভারত সরকারের কাছে চীনের হয়ে আবেদন নিবেদন এবং সেই সঙ্গে যতটা পারা যায় চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। আনন্দের ব্যাপার হলো, এদের আবেদনে তথা তাঁবেদারিতে কোনও কাজ হয়নি।

আমাদের দেশের বনে জঙ্গলে কত অসহায়ভাবে বনবাসী সমাজ বসবাস করছে। তাদের চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূর থেকে একটু পানীয় জল আনতে হয়। এই কমিউনিস্টরা এই বনবাসীদের বেঁচে থাকার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে কিছুই উন্নয়ন করেনি। কারণ এরা জানে মানুষের মধ্যে যদি দারিদ্র না থাকে, সব সুযোগ সুবিধা যদি তারা পেয়ে থাকে, তাহলে কেউ আর কমিউনিস্ট পার্টি করবে না, পার্টির ঝাণ্ডা বইবে না। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে এই সিপিএমই তাদের মিত্র দেশ কিউবাকে বিশাল খাদ্য সামগ্রী পাঠাবার জন্য সবরকম বন্দোবস্ত করেছিল।

কমিউনিস্ট শাসিত পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সদ্য ফল ঘোষণার পূর্বে, দিল্লীতে সিপিএম পার্টি অফিসে, চীনের রাষ্ট্রদূত এসে বসে ছিল। রাষ্ট্রদূত এতই দুশ্চিন্তায় ছিল যে, পার্টি অফিসে না এসে পারেনি। কি আশ্চর্য—ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এবং কেরলের নির্বাচনে জেতা-হারার জন্য চিন্তিত হচ্ছে আমাদের ভয়ঙ্কর শত্রুদেশ চীন। তাহলে এটা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশের সিপিএম পার্টির সঙ্গে চীনের গোপন ভয়ঙ্কর স্বার্থ জড়িয়ে আছে। যেটা ভারতের ক্ষেত্রে আগামীদিনে ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ। যদি কোনওদিন চীন, আমাদের এই প্রিয় ভারতবর্ষকে আক্রমণ করে, তখন কমিউনিস্টরা এদেশে চীনের হয়ে পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকা নেবে।

—দিলীপ ময়রা, কাশীনগর, দঃ ২৪ পরগনা।

প্রকৃত পরিবর্তনের স্বরূপ

পরিবর্তনের অর্থই হচ্ছে পুরাতন চলে গিয়ে নতুন কিছুর আগমন। পরিবর্তনই হচ্ছে সজীবতার লক্ষণ—পরিবর্তন না থাকলে সে তো নির্জীব। যে জাতি বা যে দেশের মানুষের কোনও পরিবর্তন নাই সে জাতি বা দেশ তো স্থবির।

কিন্তু আজ দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৬৩ বছর পরেও দেশের বুকে চলেছে দুর্নীতি, দলবাজি, কালোবাজারি, খুন-জখম। একদা জওহরলাল নেহরু কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে মারার মতো গালভরা বক্তৃতা দিয়েছিলেন কিন্তু আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি। একদিকে কিছু শ্রেণীর মানুষ ধন-সম্পদে-প্রাচুর্যে বলীয়ান—তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ, বিলাসবহুল প্রাসাদ, খানাপিনা, প্রমোদ, উৎসব; অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে অনাহার-অপুষ্টি, অশিক্ষা-অজ্ঞানতার অন্ধকারে ভরা কোটি কোটি নরনারী। বর্তমানে আমাদের এদেশে চলেছে এক সার্বিক অবক্ষয়ের যুগ। এই অবস্থার পরিবর্তন স্বাভাবিক এবং সেটা সকলেরই কাম্য। মানবিক মূল্যবোধের বিকাশের মধ্য দিয়ে সামাজিক বৈষম্য দূর করাই হবে সত্যকারের পরিবর্তন। এজন্য কিছু ত্যাগব্রতী মানুষের প্রয়োজন—যাঁরা আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাবে, তাঁরা যেন ক্ষমতায় এসে নিজের আখের না গোছায়। মোট কথা, আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে আগামী দিনে এই রাজ্যে শান্তির বাতাবরণে সুখী, সমৃদ্ধ, শোষণমুক্ত এক নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি হতে পারে। প্রতিষ্ঠিত হতে পারে প্রকৃত গণতন্ত্র।

—সুকুমার দাস, বোলপুর, বীরভূম।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ভাবনা

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ নিজ দেশের উন্নয়নের স্বার্থে যেভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটিয়ে চলেছে, তাতে বিদ্বজ্জন এবং পরিবেশবিজ্ঞানীরা আশঙ্কিত যে পৃথিবী পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় সেমিনার, কনফারেন্স, সিম্‌পোজিয়াম প্রভৃতির ব্যবস্থা করছেন। সেখানে পরিবেশ সংক্রান্ত নানা বিষয় আলোচিত হচ্ছে, পরিবেশ দূষণ নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি না ঘটানোর জন্য প্রতিশ্রুতি নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রথার রদবদল ঘটানো হচ্ছে। আমাদের ভারতও এ বিষয়ে পিছিয়ে নেই। পরিবেশ দূষণ রোধ করতে ভারতে নানা কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান, বনভূমি সংরক্ষণ, জলাশয়ের রক্ষণাবেক্ষণসহ আরও অনেক কিছু। এগুলি কার্যকর করার জন্য যথাযথ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কাজের কাজ যে কিছু হয়নি তা নয়, তবে যতটা হওয়া প্রয়োজন, সে তুলনায় সামান্যই হয়েছে। অবশ্য এর প্রধান কারণ জনসাধারণের পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে নিস্পৃহতা। দেশের তথাকথিত শিক্ষিতজনরা পরিবেশ সুস্থ রাখার বিষয়ে উদাসীন যদি না তা ব্যক্তিগতভাবে তাদের স্বার্থহানি ঘটায়। দেশের শিক্ষিত মানুষদের যদি এই মনোভাব হয় তাহলে দেশের দরিদ্র, নিরক্ষর অভাবী মানুষ যে নিজেদের বেঁচে থাকার তাগিদে সুস্থ পরিবেশকে অসুস্থ করে তুলবেন এতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

গ্লোবাল ওয়ার্মিং, গ্রীন হাউস এফেক্ট, সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট কথাগুলির সঙ্গে আমরা সবাই অল্প বিস্তর পরিচিত এবং ওয়াকিবহাল। তবে এগুলি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই, শুধুমাত্র সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা ছাড়া। দেশের উন্নয়ন কোনও দেশই অস্বীকার করতে পারে না। তবে উন্নয়নের জন্য কলকারখানা তৈরি করা এবং জ্বালানী ব্যবহার করার অর্থই হলো আবহাওয়া মণ্ডলের তাপ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন রকম বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি। কলকারখানা তৈরি এবং হাজার হাজার আবাসন তৈরি করার জন্য নির্বিচারে সবুজ বনানী ধ্বংস করা হচ্ছে। এর ফল হচ্ছে মারাত্মক। পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দক্ষিণ মেরুর হিমবাহ গলছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো পর্বতশৃঙ্গের হিমবাহ উষ্ণতার কারণে যেভাবে গলছে তাতে আশঙ্কা করা হচ্ছে শীঘ্রই তা অবলুপ্ত হবে। পৃথিবীর অন্যান্য হিমবাহ এভাবে গলতে থাকলে সমুদ্রপৃষ্ঠের জলস্তর বৃদ্ধি পাবে। ফলে সমুদ্র নিকটবর্তী ভূভাগ এবং দ্বীপ জলের নীচে চলে যাবে। আমাদের দেশের সুন্দরবনসহ অন্যান্য অঞ্চলও রেহাই পাবে না সমুদ্রের গ্রাস থেকে।

একথা অনস্বীকার্য প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে যে বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে সেই বিষাক্ত পরিবেশকে দুষণমুক্ত করার একটা ব্যাপক প্রয়াস শুরু হয়েছে সারা পৃথিবী জুড়ে। সুস্থ পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক স্তরে যে বিভিন্ন প্রচেষ্টা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো ১৯৭২-এ স্টকহোম কনফারেন্স, ১৯৯২-এ রিও-কনফারেন্স, উদ্দেশ্য পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রণয়ন করা। এ ছাড়া জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য ১৯৭১-এ রামসার কনভেনশন, ১৯৭২-এ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কনভেনশন, ওজন-এর স্তর রক্ষায় ১৯৮৫-তে ভিয়েনা কনভেনশন এবং ১৯৮৭-তে মন্ট্রাল প্রোটকল, বিপদজনক বর্জ্য পদার্থ পরিবহনে ১৯৮৯-তে ব্যাসেল কনভেনশন প্রভৃতি সহ বহু কনফারেন্স। আবার ভারতে সরকারি চুক্তির বিরোধিতা করে বেসরকারিভাবে সংগঠিত হয়েছে বনভূমি, জনপদ প্রভৃতি রক্ষার জন্য আন্দোলন যেমন নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, চিপ্‌কো আন্দোলন (চিলকা বাঁচাও আন্দোলন) প্রভৃতি। অত্যন্ত দুঃখজনক একশ্রেণীর মানুষ পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে যেমন অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন, তেমনই আবার অন্যদিকে কিছু লোভী স্বার্থপর মানুষ নির্দয়ভাবে ঘটিয়ে চলেছেন পরিবেশ দূষণ।

শহরের শিক্ষিত মানুষদের আচরণ বড়ই বিস্ময়কর। সমালোচনা করা ছাড়া অন্য বিষয়ে এঁদের পরম অনাসক্তি, এঁরা শ্রম বিমুখ, অলস। তাই আমরা বাড়ীর আবর্জনা নির্বিকারভাবে রাস্তায় ফেলি। চায়ের কাপ বা মাটির খুরি, সিগারেটের খালি প্যাকেট, পলিথিনের ক্যারি ব্যাগ বা ওষুধের শিশি সব নর্দমায় ফেলি। এতে যে নর্দমাটা বুজে যাবে আর নর্দমার জল সব রাস্তায় চলে আসবে সেটা খেয়াল থাকে না। বাড়ীর পোষা কুকুরের ল্যাট্রিন হিসেবে পাড়ার রাস্তাটাই বেছে নিই। কুকুরের ওই বর্জ্য পদার্থগুলি আমাদেরই চরণাশ্রিত হয়ে আমাদেরই গৃহে প্রবেশ করতে পারে সেটা আর খেয়াল থাকে না।

সারাদেশ জুড়ে শুরু হয়েছে প্রোমোটার-রাজ। পশ্চিমবঙ্গে প্রোমোটারি রাজ যতই পাকা হচ্ছে ততই আমবাগান, বাঁশবাগান, কলাবাগান অর্থাৎ সবুজ গাছপালা উধাও হয়ে যাচ্ছে। "একটি গাছ একটি প্রাণ" আমরা কতজন আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছি? তবে অধিকাংশ মানুষ সক্রিয় হলে সচেষ্ট হলে সবুজের শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব। রাস্তার দুধারে, পার্কে, পুকুরের চারপাশে, হাট বা বাজারের উপকণ্ঠে যদি বৃক্ষরোপণ করে সেগুলি বড় করে তোলা যায় এবং অসাধু মানুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে সেগুলি রক্ষা করা যায় তাহলে পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে কিছুটা অন্ততঃ রক্ষা করা সম্ভব।

তবে শহরের শিক্ষিত মানুষদের আচরণ বড়ই বিস্ময়কর। সমালোচনা করা ছাড়া অন্য বিষয়ে এঁদের পরম অনাসক্তি, এঁরা শ্রম বিমুখ, অলস। তাই আমরা বাড়ীর আবর্জনা নির্বিকারভাবে রাস্তায় ফেলি। চায়ের কাপ বা মাটির খুরি, সিগারেটের খালি প্যাকেট, পলিথিনের ক্যারি ব্যাগ বা ওষুধের শিশি সব নর্দমায় ফেলি। এতে যে নর্দমাটা বুজে যাবে আর নর্দমার জল সব রাস্তায় চলে আসবে সেটা খেয়াল থাকে না। বাড়ীর পোষা কুকুরের ল্যাট্রিন হিসেবে পাড়ার রাস্তাটাই বেছে নিই। কুকুরের ওই বর্জ্য পদার্থগুলি আমাদেরই চরণাশ্রিত হয়ে আমাদেরই গৃহে প্রবেশ করতে পারে সেটা আর খেয়াল থাকে না। রাস্তায় চলতে ফিরতে যেখানে সেখানে পানের পিক্ কফ থুথু ফেলা বা প্রকৃতির আহ্বানে যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে যাওয়া আমাদের মজ্জাগত অভ্যাস। যদিও বহুলাংশে কমে গেছে তবুও পুণ্যতোয়া, গঙ্গা কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ শহরের নোংরা জল, মলমূত্র, মৃত পশুর পচা গলা শব বক্ষে ধারণ করে ঘৃণ্যতোয়া নামে পরিচিত। এ পৃথিবীকে, পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে না পারলে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে আমাদের কি জবাবদিহি হবে? "এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার"—এর মূল্য কি রইল?

(৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত)

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

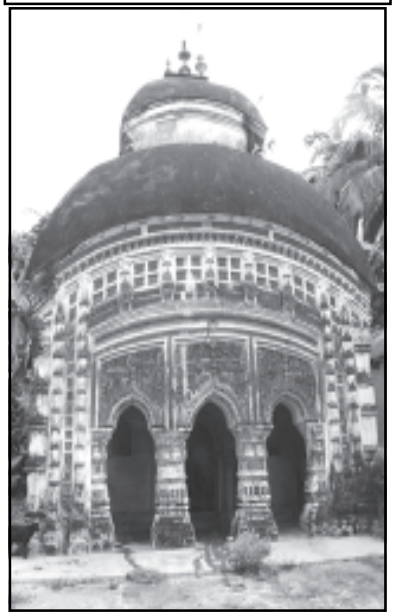

হুগলী জেলার গোঘাটে কিছু অপরিচিত মন্দির-দেবালয়

ডঃ প্রণব রায়

বিগত প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে পশ্চিমবাংলা তথা ভারতের নানা স্থানে আমাদের পুরাকীর্তিগুলি, বিশেষ করে, প্রাচীন মন্দিরগুলির অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ করে আমার ধারণা হয়েছে, বাংলার মন্দির, বিশেষ করে ইঁটের মন্দির ও তার প্রায় চল্লিশ শতাংশের পোড়ামাটির মূর্তি ('টেরাকোটা') এক অপরূপ সৃষ্টি। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের বাংলার মন্দিরগুলি খুব প্রাচীন নয়, এবং বেশিরভাগ স্বল্পস্থায়ী ইঁট দিয়ে তৈরি হলেও এগুলির এক বিশেষ ধরনের স্থাপত্য ও অলংকরণ ভারতের আর কোনও রাজ্যে পাওয়া যাবে না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বৈষ্ণব আন্দোলনের বিশেষ প্রভাবে খৃস্টীয় ষোল শতকের শেষ দিক থেকে বাংলার 'চালা' 'একচালা', 'দোচালা', 'জোড়াবাংলা', 'চারচালা', 'আটচালা', 'চাঁদনি', 'দালান', 'রত্ন' ও 'দেউল' শৈলীর মন্দিরের যে অভাবনীয় বিকাশ ঘটে, তার ফলে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, তাঁর সংলগ্ন হুগলি ও মেদিনীপুর জেলায় 'টেরাকোটা' মন্দিরের অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। মুসলিমপূর্ব যুগে হিন্দু আমলে যেসব স্থাপত্যশৈলী ও 'টেরাকোটা'-অলংকরণের কোনও অস্তিত্ব ছিল না।

এটা সত্য, হিন্দু আমলে, বিশেষ করে, পাল-সেন যুগে (খৃঃ ৯ম-১২শ শতক) সু-উচ্চ 'শিখর' দেউল বাংলায় শ্রীচৈতন্যপরবর্তী যুগে তৈরি হয়নি, কিন্তু পূর্বোক্ত শৈলীর মন্দির ও দেওয়ালের মূর্তি, ফুল লতাপাতার অলংকরণের প্রাচুর্য আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। কেউ যদি বিষ্ণুপুরের শ্যাম রায়ের 'পঞ্চরত্ন' (১৬৪৩ খৃঃ), কেষ্টরায়ের 'জোড়বাংলা' (১৬৫৫ খৃঃ), মদনমোহনের 'একরত্ন' মন্দিরগুলো (১৬৯৪ খৃঃ) লক্ষ্য করেন, তাহলে সহজেই বোঝা যাবে, বাংলার মন্দিরের স্থাপত্য ভাস্কর্যশৈলী কতটা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এর সঙ্গে মেদিনীপুরে চন্দ্রকোণা বা ঘাটাল অঞ্চল এবং হুগলির বহু স্থানের টেরাকোটা মন্দিরগুলো আমাদের প্রকৃতই অবাক করবে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার নিরীখে এবং আমার বহু রচনার মধ্যে আমি অনেকবার একথা বলে আসছি।

২০০৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে হুগলি জেলার গোঘাট থানার অন্তর্গত হাজিপুর, নকুণ্ডা, গোয়ালসাঁড়া, বালি-দেওয়ানগঞ্জ, রাধাবল্লভপুরপ্রভৃতি স্থানের পুরানো মন্দিরগুলি আমার দেখার সুযোগ হয়। সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও এগুলি সাধারণের কাছে তেমন পরিচিত নয়। হুগলির বাঁশবেড়িয়া, গুপ্তিপাড়া, আঁটপুর প্রভৃতি স্থানে মন্দিরগুলির স্থাপত্যশৈলী ও 'টেরাকোটা'র কারুকার্য যেমন দর্শকদের সহজেই আকর্ষণ করে, এগুলি হয়তো তেমন নয়। তবুও নিতান্ত অবহেলিত, জঙ্গলাকীর্ণ, ভগ্ন জীর্ণ এই মন্দিরগুলির কয়েকটিতে স্থাপত্যশৈলী ও 'টেরাকোটা'-সমাবেশ লক্ষ করার মতো। হাজিপুর ও বালি-দেওয়ানগঞ্জ ছাড়া অন্য সব স্থানে যাওয়া কঠিন। যানবাহনের তেমন কোনও সুবিধাও নেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই এগুলির সংক্ষিপ্ত বিররণী এখানে উপস্থিত করা হলো।

হাজিপুর

দক্ষিণ-পশ্চিম হুগলির একেবারে সীমান্তে মেদিনীপুর জেলার সংলগ্ন হাজিপুর আরামবাগ-ক্ষীরপাই পাকা রাস্তার পার্শ্ববর্তী এই গ্রামে রাস্তার ধারেই লক্ষ্মীজনার্দনের 'নবরত্ন' মন্দির। ইঁটের এই পূর্বমুখী মন্দিরটি স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'নবরত্নে'র প্রচলিত যে রীতি ভূমিতল নিয়ে ওপরে আরও দুটি তল থাকে, সকলের ওপরের দালানে যেমন কেন্দ্রীয় 'রত্ন' নিয়ে চারকোণে চারটি 'রত্ন' এবং তার নীচের দালানের চারকোণে চারটি 'রত্ন' নিয়ে যেমন 'নবরত্ন' মন্দির একসময় অনেক তৈরি হয়েছিল, এখানে সেই প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেছে অর্থাৎ নয়টি চূড়ো বা 'রত্ন'ই দ্বিতলের ছাদে স্থাপনে করা হয়েছে। ১২৩৪ বঙ্গাব্দ বা ১৮২৭ খৃস্টাব্দে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হলেও এটি বেশ জরাজীর্ণ। মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে কার্নিশের নীচে খোপে খোপে কিছু 'টেরাকোটা' আছে। ওপরের খাঁজকাটা ঢালের 'রত্ন'গুলি সুদৃশ্য। 'গর্ভগৃহ' কিন্তু প্রশস্ত নয়। ভেতরে দক্ষিণ দিক থেকে একটি ঢাকা সংকীর্ণ গুপ্ত পথ গর্ভগৃহতে বেষ্টন করে উত্তরদিকের দেওয়ালের সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলে পৌঁছেছে। বাতাস আসার জন্যে ওপরে দেওয়ালের গায়ে একটি 'গবাক্ষ' বা ছোট্ট গর্ত আছে।

মন্দিরটি লক্ষ্মীজনার্দনের হলেও বেশ কিছুকাল আগে থেকে গম্ভীরায় শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত। শোনা যায়, উত্তরপাড়ার কোনও জমিদার এটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে বিধুমুখী দাসী নামে এক ধনী বিধবা মহিলা এর সংস্কার করেন। তিনি নিকটবর্তী এক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। জনশ্রুতি, এই মন্দিরে অধিষ্ঠিত শিবকে কাছাকাছি কোনও মন্দির থেকে এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এখানে লক্ষ্মীজনার্দন শিলাবিগ্রহকে সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পৌরশহর রামজীবনপুর এখান থেকে মাত্র চার-পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে। রামজীবনপুরে বহু মন্দির বর্তমান লেখক দর্শন করেছেন। কিন্তু হাজিপুরের মন্দিরের এই স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতো। আরও উল্লেখ্য, মন্দিরের সামনে প্রতিষ্ঠাকালীন লিপিটি অস্পষ্ট হলেও পাঠোদ্ধার করা গেছে।

হাজিপুরের কিছুটা পূর্বে নকুণ্ডা। এখানের 'সপ্তরথ' শ্রেণীর উচ্চ 'দেউল' উল্লেখযোগ্য। পূর্বমুখী ইঁটের এই মন্দিরের গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ গম্ভীরায় প্রতিষ্ঠিত। গাজন চৈত্র মাসে হয়। মন্দিরের উচ্চতা আনুমানিক ৫৫ ফুট। সামনে টিনের 'আটচালা ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ বা ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে নির্মিত হয়। মন্দিরের মাথায় সুদৃশ্য 'আমলক', 'কলস' ও 'ত্রিশূল' স্থাপিত।

এই অঞ্চলের গোয়ালসাঁড়া গ্রামে চৌধুরী পরিবারের দুটি 'আটচালা' রীতির পরিত্যক্ত মন্দির উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে 'ত্রিরথ' বিন্যাস বা ওপর থেকে নীচে তিনটি খাঁজ' বর্তমান যা প্রচলিত 'আটচালা' শৈলীর মন্দিরে খুব কম দেখা যায়। এই গ্রামের চৌধুরী পরিবার এককালে খুব সম্পন্ন ছিল। মন্দিরের কাছে তাঁদের ভগ্ন অট্টালিকা দেখা যায়।

বালি-দেওয়ানগঞ্জ

গোঘাট থানার এই গ্রাম এককালে বেশ সমৃদ্ধি ছিল। কয়েকটি সম্পন্ন পরিবার এখানে বাস করতেন। তার পূর্ব সমৃদ্ধির পরিচয় এখানকার বেশ কয়েকটি ভগ্নজীর্ণ মন্দির-দেবালয়, অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি। গ্রামটির পাশ দিয়ে দ্বারকেশ্বর নদী প্রবাহিত।

মন্দিরগুলির দু-একটি ছাড়া বেশির ভাগ মন্দিরেরই প্রতিষ্ঠাকালীন কোনও লিপি পাওয়া যায় না। তবে স্থাপত্যদৃষ্টে এগুলি প্রায় সবই খৃস্টীয় শতকের শেষ বা উনিশ শতকের গোড়া থেকে ওই শতকের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে তৈরি হয় বলে অনুমান করা যায়।

অবশ্য, রাধাবল্লভপুরের দিকে যাওয়ার পথে পাকা রাস্তার ধারে জঙ্গলাকৃত ও নোংরা আবর্জনায়

পূর্ণ একটি প্রশস্ত ‘একরত্ন’ রীতির মন্দির বেশ পুরানো। অনুমান, এটি খৃস্টীয় সতেরো শতকের শেষ বা আঠারো শতকের গোড়ার দিকে তৈরি হয়ে থাকবে। ছোট ছোট ফলকে বেশকিছু টেরাকোটা মূর্তি, ফুল, লতাপাতার নক্‌সা, ‘থাম’ ও খিলানের গঠন আঠারো শতকীয় শৈলীর পরিচায়ক। মন্দিরের ত্রিখিলান প্রবেশপথের ওপরের প্রস্থে ‘টেরাকোটা’ মূর্তি ছোট ছোট টালিতে বসানো, মন্দিরটি দক্ষিণমুখী ছিল। পশ্চিমেও ত্রিখিলান প্রবেশপথ আছে। এটি লক্ষ্মীজনার্দনজীউর মন্দির ছিল জানা যায়। ‘গর্ভগৃহে’ যেখানে বিগ্রহ অধিষ্ঠিত ছিলেন সেখানে একটি বেদি লক্ষ্য করা যায়। ‘ত্রিখিলান’ প্রবেশপথে ঢাকা বারান্দা এখনও আছে। মন্দিরের ছাদের ওপর কেন্দ্রীয় ‘রত্ন’টি উচ্চ ও ‘ঢাল’ খাঁজকাটা। ‘দালাল’-বংশীয় কোনও ব্যক্তি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়।

এই মন্দিরের কিছুদূরে ‘রাউথ পাড়ায়’ বালি দেওয়ানগঞ্জের সর্বাপেক্ষা দর্শনীয় মন্দির দুর্গার ‘জোড়বাংলা-নবরত্ন’। উত্তরমুখী ইঁটের এই মন্দিরটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, একটি ‘জোড়াবাংলা’ শৈলীর মন্দিরের ওপর একটি ‘নবরত্ন’ স্থাপিত। গ্রাম পরিক্রমায় দীর্ঘকাল ধরে যত মন্দির আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তার মধ্যে এ ধরনের শৈলীর মন্দির একান্তই বিরল। আরও বৈশিষ্ট্য হলো, মন্দির-প্রবেশমুখে একটি অপরিসর ‘দোচালা’-‘জগমোহনে’র ওপরে কার্নিশের নীচে দশভুজা মহিষমর্দিনী ও তার পাশে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীর পৃথক পৃথক ‘টেরাকোটা’-মূর্তি।

এই সুদৃশ্য মন্দির পশ্চিমবাংলার এক উৎকৃষ্ট ও নূতন স্থাপত্যশৈলীর দেবালয়। মন্দিরের চারপাশ আগে প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। এই মন্দিরের পাশে আর একটি মন্দির ভগ্ন। দুর্গামন্দিরের পশ্চাতে দশদুর্গার মন্দির ও তার পাশে আর একটি ভগ্ন মন্দির। কোনও মন্দিরেই কোথাও কোনও লিপি নেই। তবে ইঁটের গঠন, বর্ণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত টেরাকোটা শৈলী লক্ষ্য করে এগুলি নিঃসন্দেহে আঠারো-উনিশ শতকের বলা যায়।

দুর্গামন্দিরে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব হয়। এই মন্দিরটি ছাড়া পার্শ্ববর্তী আরও তিনটি উৎকৃষ্ট ‘টেরাকোটা’-মন্দিরের অবস্থা খুবই শোচনীয়।

‘রাউথ পাড়ার’ প্রায় দু কিলোমিটার দক্ষিণে একটি পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ‘ঘোষের বেড়’ নামে পরিচিত। এটি বহু আগে একটি ‘ঠাকুরবাড়ি’ ছিল। এখানে ঘোষেদের ভগ্ন অট্টালিকা, তার পাশে ভগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত দামোদরের বৃহৎ ‘আটচালা’ ও আরও দুটি ছোট ‘আটচালা’ রীতির মন্দির বর্তমান। বিশালাকার পূর্বমুখী ‘আটচালাটি’ ১২২৯ বঙ্গাব্দ বা ১৮২২ খৃস্টাব্দে রামহরি ঘোষ প্রতিষ্ঠা করেন। লিপি থেকে তা জানা যায়। মন্দিরের সামনের দেওয়ালে প্রচুর ‘টেরাকোটা’ মূর্তি বর্তমান। গর্ভগৃহের কাঠের দরজায় কারুকার্য আছে। দামোদর মন্দিরের পাশে একটি প্রাঙ্গণ পরিত্যক্ত। আগে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। তার চিহ্ন আছে।

এর কিছুদূরে পাকা রাস্তার পূর্ব দিকে একটি জীর্ণ তেরচূড়ার ‘রাসমঞ্চ’ বর্তমান। রাসমঞ্চের দেওয়ালের কোনও কোনও স্থানে দণ্ডায়মান প্রমাণ আকারের নারীমূর্তি অধিষ্ঠিত। পার্শ্ববর্তী রাধাবল্লভপুর গ্রামে সত্যপীরের ক্ষুদ্রাকৃতি ‘নবরত্ন’ মন্দির ভগ্ন ও অবহেলিত। পাকা রাস্তার ধারে এই মন্দির শৈলীতে হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যকৌশল অনুসৃত হয়েছে। এছাড়া কিছুদূরে রায়বাঘিনীর জীর্ণ ও ভগ্ন ‘পঞ্চরত্ন’ মন্দিরটির অবস্থা খুবই শোচনীয়।

মন্দিরগুলিকে সংরক্ষণ করার কোনও উৎসাহ এখন আর কারও মধ্যে তেমন লক্ষ করা যায় না। সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞানের এদিকে লক্ষ করার সময় নেই। এই বিভাগের মাধ্যমে এখন কলকাতায় শুধু ‘সেমিনার’ হয়। কাজেই আমাদের প্রাচীন গৌরা এই শিল্প ধ্বংসোন্মুখ ও শীঘ্র ধ্বংসের পথে।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ

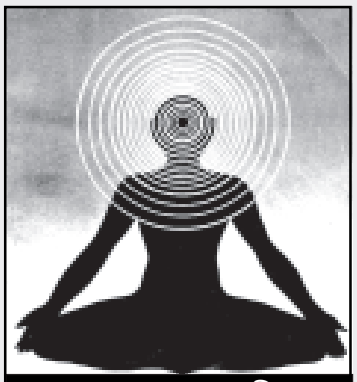

ভারতের শাশ্বত মনীষা

চিরন্তন চক্রবর্তী॥

বাংলার তন্ত্রসাধনায় কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। এই দেশে যদি আর একজনও তন্ত্রকার না জন্মাতেন, তা হলেও বাঙালী একমাত্র কৃষ্ণানন্দকে নিয়েই গর্ব করতে পারত। কেউ কেউ মনে করেন চৈতন্যের (১৪৮৬-১৫৩৩) কিছুকাল পরে কৃষ্ণানন্দের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে কৃষ্ণানন্দের জন্ম হয়েছিল ১৫০০ খৃস্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে। ভট্টাচার্যের মতে, ওঝা পদবীধারী জনৈক ব্রাহ্মণের অধস্তন সপ্তমপুরুষ ছিলেন কৃষ্ণানন্দ। কৃষ্ণানন্দের সপ্তম পুরুষ আবার প্রাণতোষিণীকার রামতোষণ। আনুমানিক ১৫৮০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সংকলিত তন্ত্রসার কৃষ্ণানন্দের বিখ্যাতগ্রন্থ। তন্ত্রের আভিধানিক গ্রন্থ তন্ত্রসার। গ্রন্থখানির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এই গ্রন্থে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের তন্ত্রেরই সার সংকলিত রয়েছে। বঙ্গদেশে প্রচলিত কালীর রূপ কৃষ্ণানন্দই প্রথম উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি এইদেশে কালী পুজোর প্রবর্তন করেছিলেন। এই গ্রন্থের পুঁথি বঙ্গাক্ষর ছাড়া অন্যান্য লিপিতেও মেলে। কৃষ্ণানন্দ দুর্গাপুজোয় কুমারী পুজো সম্বন্ধে বলেছেন,—কুমারীপুজো ব্যতীত হোমসম্পূর্ণ ফলদায়ক হয় না। এক বৎসর হতে ষোড়শবর্ষীয়া বালিকা কুমারী। যদিও তন্ত্রসারে দুর্গাপুজোর পৃথক আলোচনা নেই। তবে দুর্গামন্ত্র, মহিষমর্দিনীমন্ত্র, দুর্গাশতনাম, দুর্গাকবচ, দুর্গাযন্ত্র প্রভৃতি রয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রে বশীকরণ, উচাটন, অভিচার প্রভৃতি সংক্রান্ত প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ রয়েছে। তন্ত্রসারে বহুতন্ত্রের ও তন্ত্ররচয়িতার উল্লেখ রয়েছে। অমৃতানন্দ ভৈরব ও রামানন্দতীর্থ তন্ত্রসারের পরিমার্জিত রূপ প্রস্তুত করেছিলেন। রামানন্দ ছিলেন অষ্টাদশ শতকে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজপণ্ডিত। ‘শ্রীতত্ত্ববোধিনী’ নামে অপর একখানি গ্রন্থও আগমবাগীশ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে কৃষ্ণানন্দ নদীয়া জেলার মানুষ, নবদ্বীপের কাছাকাছি কোনও অঞ্চলে তাঁর জন্ম হয়েছিল। কারণ কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রবচনে বা আলোচনায় স্মৃতিশাস্ত্রের একটা প্রভাব রয়েছে। আবার তান্ত্রিক সাধনা দ্বারা মানুষ দেবত্ব লাভ করতে পারে বলে তন্ত্রবচনে রয়েছে। জীব শিবে পরিণত হতে পারে। উপনিষদেও জীবাত্মার পরমাত্মারূপে পরিণতির উপায় রয়েছে। তা হলে তান্ত্রিক ও বৈদান্তিক পদ্ধতির প্রভেদ কি? পূর্ণানন্দের শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির অন্তর্গত ষট্‌চক্রনিরূপণ তো নিখিল ভারত প্রসিদ্ধ। আর তন্ত্রসারের জনপ্রিয়তা সুদূর নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ণানন্দের তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী নামে একগ্রন্থের ওড়িশি অক্ষরে লিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়েছে।

দশহরায় গঙ্গাবন্দনা

নবকুমার ভট্টাচার্য

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লদশমী তিথিকে বলা হয় দশহরা। এই তিথিতে গঙ্গাস্নান করলে পূর্বদশজন্মকৃত এবং এ জন্মের দশবিধপাপ নাশ হয়। তাই নাম দশহরা। দশহরার প্রধানকৃত্য গঙ্গাস্নান। স্কন্দপুরাণে এইদিন দশটি পুষ্প, দশ ফল, দশ নৈবেদ্য, দশ প্রদীপ ও দশাঙ্গধূপ দিয়ে গঙ্গাকে পুজো করতে বলা হয়েছে। পবিত্র মনে করে মৎস্যজীবীরাও দশহরার দিনটি পালন করে থাকেন। কোনও কোনও অঞ্চলে দশহরার দিনে মনসা পুজোও করা হয়ে থাকে। দশহরার অনুষ্ঠান কোনও কোনও ক্ষেত্রে উৎসবের আকার নেয়। অনেক স্থানে মেলাও বসে। মুর্শিদাবাদের গিরিধারীপুরে, জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জে, নদীয়ার আনন্দবাসে দশহরার মেলা খুব প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। পূর্ববাংলার নোয়াখালিতে নাকি দশহরা উপলক্ষে বিবাহিতা মেয়েদের 'নায়র' নেওয়া হয় অর্থাৎ মেয়েরা স্বামীর ঘর থেকে এই সময় পিত্রালয়ে আসে। এ যেন দুর্গাপুজোর আগমনীর মতো। দেবী দুর্গা যেমন শরৎকালে পিতৃগৃহে আসেন তেমনই গঙ্গাদেবী দশহরা তিথিতে স্বামীর গৃহ থেকে বাপের বাড়ীতে পদার্পণ করেন। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে বলা হয়েছে সরিদ্ধরা গঙ্গাই দশহরা। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা দশমীতে গঙ্গা মর্তে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। তিনিই এই দিনে দশপাপ হরণ করেন। ''দশম্যাং শুক্লপক্ষে চ জ্যৈষ্ঠ মাসি কূজে দিনে/অবতীর্ণা যতো গঙ্গা হস্তার্ক্ষে চ সরিদ্ধরা/হরতে দশ পাপানি তস্মাদ্দশহরা স্মৃতাঃ।'' এই সূত্রেই দশহরার সঙ্গে গঙ্গার উৎপত্তি ও মর্তে অবতরণের পৌরাণিক কাহিনীর যোগ। গঙ্গার মর্তে অবতরণ কাহিনী সর্বত্র এক হলেও উৎপত্তির কাহিনী পুরাণ ভেদে ভিন্ন। পুরাণের মতে স্বর্গগঙ্গাই ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হয়ে মহাদেবের জটা ভেদ করে হিমালয়ের গোমুখ হয়ে মর্তে অবতরণ করেন। গঙ্গা ত্রিলোকপাবনী। দ্যুলোকে তাঁর নাম সুরধুনী মন্দাকিনী। ভূলোকে তিনি অলকানন্দা-ভাগীরথী আর পাতালে তিনি ভোগবতী। গঙ্গা বিষ্ণুপদী। বিষ্ণু যে পরম পদ তা মোক্ষপদ, বিষ্ণুর সেই পরমপদ স্থানই গঙ্গার উৎপত্তি স্থান। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আবার বলা হয়েছে, নিত্য গোলকে শিবের গান শুনে রাধাকৃষ্ণের একীভূত যুগলাঙ্গ দ্রবীভূত হয়। এই দ্রবময়ীই গঙ্গা। সলিল রূপিণী হয়েও তিনি বিগ্রহবতী। অপরূপা রূপ তাঁর। যেন তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা, যেন শরৎচন্দ্রসম প্রভা। তিনি কৃষ্ণ থেকে উৎপন্না হয়ে কৃষ্ণের প্রতি সকামা হলেন। দেখে ক্রুদ্ধা হলেন রাধা। গঙ্গা সভয়ে স্বজলে প্রবেশ করলেন। রাধা সেই জলরাশি গণ্ডুষে পান করতে উদ্যত হলে গঙ্গা জলরাশিসহ কৃষ্ণপদে আশ্রয় নিয়ে লুকিয়ে রইলেন। এদিকে জলের অভাবে স্বর্গমর্ত মৃতপ্রায় হয়ে উঠল। প্রজাপতি ব্রহ্মা বিপন্ন হয়ে বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন। বিষ্ণু তখন পাদাঙ্গুষ্ঠ নখাগ্র থেকে তাঁকে মুক্ত করে দিলেন এবং বললেন বৈকুণ্ঠের চতুর্ভুজ বিষ্ণু হলেন তাঁর পতি। সেই থেকে গঙ্গা বিষ্ণু ভার্যা। কোনও কোনও পুরাণ মতে গঙ্গার উৎপত্তি হিমালয়েই। গঙ্গা হিমরাজ দুহিতা। বামন পুরাণ মতে, সুমেরুকন্যা মেনার সঙ্গে হিমবাহের বিবাহ হয়েছিল। মেনার এক পুত্র ও তিন কন্যা। কন্যাদের নাম কুটিলা, রাগিণী ও কালী। সতীর দেহত্যাগ হলে দেবতারা নিজ প্রয়োজনেই শিবকে পুনরায় বিবাহ দিতে উদ্যোগী হন। তখন তাঁরা কুটিলাকে পছন্দ করে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হন। ব্রহ্মা কুটিলাকে দেখে বললেন, এ শিবতেজ ধারণ করতে পারবে না। একথা শুনে কুটিলা ক্রুদ্ধ হন। তখন ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, তুমি সলিলরূপে পরিণত হও। অভিশপ্তা কুটিলা জলময়ী হয়ে ব্রহ্মলোক প্লাবিত করতে উদ্যত হলে ব্রহ্মা তাঁকে কমণ্ডলুতে আবদ্ধ করে রাখেন। তারপর বলির যজ্ঞে বিষ্ণুপদে স্বর্গলোক আক্রান্ত হলে তিনি কমণ্ডলু জলে সেই পদ ধৌত করেন। এভাবেই মর্তের কন্যা স্বর্গলোকে পুণ্যদা জলময়ী স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনী নামে পরিচিতা হন।

স্বর্গগঙ্গার মর্ত্যে অবতরণের সঙ্গে দুটি অভিশাপ জড়ানো রয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে, গঙ্গা যখন বিষ্ণুভার্যা হয়ে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সঙ্গে অবস্থান করছিলেন, তখন একদিন ঈর্ষাপরবশ হয়ে সরস্বতী তাঁকে অভিশাপ দেন, তুমি নদী হয়ে মর্তে গমন কররে। গঙ্গার মর্তে আগমনের দ্বিতীয় কারণটি হলো, মা মেনকার অভিশাপ। মেনকা কন্যা যখন দেবতাদের সঙ্গে শিবের দুহিতা হওয়ার আশায় স্বর্গে গিয়েছিলেন, তখন তিনি মায়ের অনুমতি না নিয়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন। যেহেতু আমাদের অনুমতির অপেক্ষা না করে তুমি স্বেচ্ছায় স্বর্গে গিয়েছ সেই হেতু তুমি আবার নদী হয়ে ঊর্ধ্বলোক থেকে অধোলোকে পতিত হবে। তোমার নাম হবে গঙ্গা। এছাড়াও ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনীটি রামায়ণের আদিকাণ্ডে, মহাভারতের বনপর্বে এবং বিভিন্ন পুরাণে রয়েছে।

গঙ্গা জলময়ী হলেও পুরাণে তাঁর বিগ্রহ কল্পনা হয়েছে। গঙ্গা শ্বেতরূপা ও ত্রিনেত্রা। তাঁর চার হাত। দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বর ও অভয়মুদ্রা। বামহস্তদ্বয়ে পদ্ম ও সুধাকলস। তিনি মকরবাহনা নানা অলঙ্কারে ভূষিতা।

এককালে গঙ্গার মর্তে আগমন হলেও আজ খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক মার্কিন পরিবেশবিদ লেস্টার আর ব্রাউন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, এই শতাব্দীর শেষে গঙ্গা পরিণত হতে চলেছে মৌসুমী নদীতে। অর্থাৎ বর্ষার ঋতু ছাড়া বছরের অন্য সময় গঙ্গা থাকবে শুকনো। যে দ্রুতহারে হিমালয়ের হিমবাহগুলি গলে যাচ্ছে সেই হার বজায় থাকলে ২০৩৫ সালের মধ্যেই সমগ্র হিলাময় থেকে সব হিমবাহের অস্তিত্বই মুছে যাবে। গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে গঙ্গার ৭৫ শতাংশ জল আসে। প্রতি বছর ১৭ মিটার দূরে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ শুকিয়ে যাচ্ছে গঙ্গোত্রী হিমবাহ। একই অবস্থা অন্যতম বৃহৎ পিণ্ডারি হিমবাহের। এই হিমবাহটিও ৯.৫ মিটার করে শুকিয়ে যাচ্ছে। গঙ্গাই যদি শুকিয়ে যায়, আগামীদিনে দশহরা তিথিটি থাকবে। তবে পুরাণের পাতায়।

(আগামী ১১ জুন দশহরা তিথি উপলক্ষে প্রকাশিত)

শতবর্ষের সরণি বেয়ে হাসিরাশি দেবী

মিতা রায়

আজ যাঁরা পঞ্চাশোর্ধে পৌঁছেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই শিশুবেলায় যোগীন্দ্রনাথ সরকার, হাসিরাশি দেবী, সুখলতা রাও প্রমুখ ছড়াকারদের ছড়া পড়ে বড় হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হাসিরাশি দেবী শুধুমাত্র ছড়াকার ছিলেন না, কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছিল তাঁর অনায়াস বিচরণ। এ ছাড়াও তাঁর অন্যতম পরিচয় চিত্রশিল্পী হিসেবে। সেই সময়কার সংরক্ষণশীল সমাজের বলয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই নিজের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়ে সাহিত্য শিল্পজগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। শতবর্ষের সরণিতে আজ তিনি। তাঁর সাহিত্য কীর্তি ও শিল্পসাধনার স্বাক্ষর সম্পর্কে সকলেরই জানা দরকার।

পরাধীন ভারতবর্ষে গোঁড়া হিন্দুসমাজে নারীশিক্ষার প্রচলন তেমন ছিল না। তবু এলিট সমাজে কেতাদুরস্ত পরিবারে যদিও বা চলত পড়াশোনা করার একটা আগ্রহ; কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা ছিল দূর অস্ত। উত্তর পশ্চিম পরগণায় খাটুয়ার গোবরডাঙ্গায় জন্ম হয় হাসিরাশি দেবীর। ১৯১১-তে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তারিখ বা দিনটি জানা যায় না। কিন্তু তাঁর জীবন ছোট থেকেই ছিল দুঃখময়। তাঁর দিদি ছিলেন সে সময়কার স্বনামধন্য সাহিত্যিক প্রভাতী দেবী সরস্বতী। যাঁর ভেতরে সুপ্ত প্রতিভার জোরেই তিনি প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছিলেন; বিদ্যালয়ের পুঁথিগত শিক্ষালাভ করতে পারেননি। যখন হেসেখেলে বেড়াবার কথা, তখনই অকস্মাৎ বাবার মৃত্যু জীবনে অন্ধকার নামিয়ে আনে। এমনই পরিস্থিতিতে মা ও দিদির সঙ্গে মামার বাড়ি চলে আসেন। এরপর আর কি! বয়স হলে বিয়ে দিতে হবে—তখন এটাই ছিল সমাজের রীতি। মাত্র এগারো বছর বয়সে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া। এরপর আরও অন্ধকার নেমে এসেছিল কিশোরী বধূটির জীবনে। স্বামীকে নিয়ে সংসারে শান্তি ছিল না। তার মধ্যে একটিমাত্র কন্যাসন্তানকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। একরাশ হাসির পরিবর্তে তাঁর জীবনে ছিল গভীর এক বেদনা। কিন্তু ব্যক্তিত্বময়ী হাসিরাশি দুঃখের আঘাতে নিজেকে প্রতিভার বিকাশে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। দুঃখ-যন্ত্রণাই তাঁর উত্তরণ ঘটিয়ে জীবনে প্রসিদ্ধিলাভের পথ প্রশস্ত করেছিল। তাঁর জীবনে পরম পাওয়া জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দুই বিখ্যাত গুণী শিল্পীর ঘনিষ্ঠতা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমাজের প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই তিনি লেখা ও ছবি আঁকতে থাকেন। তবে সবটাই চলত গোপনে। প্রতিভাকে কখনওই দমিয়ে রাখা যায় না; তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবি আঁকা দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁর নাম দিয়েছেন 'চিত্রলেখা'। সেই একইভাবে অবনীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টিতে পড়েন তিনি শিল্প কীর্তির জন্য। অবনীন্দ্রনাথের

কাছেই পেন্টিং-এর শিক্ষালাভ।

ভাস্কর হাসিরাশির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সরকারি চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের কিছু কাজে। এ ব্যাপারে তাঁর প্রশিক্ষণ সরকারি চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে। সে সময়কালে তাঁর জীবনের ব্যতিক্রমী ঘটনা যে, তাঁর শিল্পকীর্তি প্যারিসে প্রকাশিত হয় এবং বিক্রিও হয়। চিত্রশিল্পী হাসিরাশির জীবনের আরেক কীর্তি হলো সাহিত্য রচনা। শুধু তুলি নয়, কলম তাঁর হাতে ছিল ধারালো। তাঁর কাব্য সৃষ্টি অনন্য নজির গড়েছিল সে যুগে। ছড়া লিখেছেন ছোটদের জন্য, পাশাপাশি অসংখ্য কবিতা লিখে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'বর্ণালী'-র ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবিতা- ছড়া নয়, গদ্য রচনাতেও ছিল তাঁর নিপুণ শৈলী। ঐতিহাসিক, রহস্য উপন্যাস ও জীবনীমূলক রচনা লিখেছেন বেশ কয়েকটি। সাহিত্য রচনায় হাসিরাশির প্রেরণা ছিলেন তাঁর অগ্রজা। তবে তাঁর বেশিরভাগ রচনাতেই প্রকাশ পেয়েছে বিষাদ। এটা স্বাভাবিকই, কারণ জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের পর থেকেই তাঁর জীবনে এসেছে একের পর এক ঘাত-প্রতিঘাত। তাঁর সাহিত্য কীর্তির জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভুবনমোহন স্বর্ণপদক লাভ করেন। সে যুগে কোনও এক বাঙালি ঘরের বধূর এই সম্মান পাওয়া এক বিশেষ নজির সৃষ্টি নিঃসন্দেহে। এতো গেল লেখনীর দক্ষতার পরিচয়। কিন্তু কণ্ঠে সুর ছিল ঈশ্বর প্রদত্ত। ললিতকলার সবরকম প্রতিভার অধিকারী ছিলেন হাসিরাশি। আকাশবাণী রেডিওতে এবং এইচ এম ভি-তে গান করেছেন, যা পরে রেকর্ড হয়ে প্রকাশ পায়।

এত প্রতিভাময়ী হাসিরাশি দেবী শুধু নীরবে বসে শিল্পকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন না। নারী যে কালে পরাধীন ছিল, সে যুগে বসে নারী প্রগতির কথা বলতেন সোচ্চারে এমন কি আকাশবাণীতেও বিভিন্ন সভাসমিতিতে নারী সচেতনতা ও প্রগতি নিয়ে ভাষণ দিতেন। এহেন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বময়ী গুণী মহিলার কথা বাঙালি ভুলতে বসেছে। নীরবে তাঁর শতবর্ষ পেরিয়ে গেল। সাহিত্য-শিল্প বা সঙ্গীত মহলে কোনও হেলদোল নেই তাঁকে নিয়ে। পরবর্তী প্রজন্মর কাছে তিনি অপরিচিতা হয়ে রইলেন। অথচ, বাংলার সমাজে, বিশেষত নারী সমাজে তাঁর কর্মকাণ্ড ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্বরূপ। দুঃখ-আঘাতের মধ্য দিয়ে যে আপন ব্যক্তিত্বে ও আপন প্রতিভায় স্ব-মহিমায় বাঁচা যায়, তা দেখিয়ে ছিলেন।

উনি হয়তো কোনও কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন না, কারণ আজীবন দুঃখ-কষ্ট পেয়ে গেছেন। যে মহিলার সে সময়ে এত যোগ্যতা সম্মান— তাঁকে কিনা শেষ বয়সে অসুস্থ অবস্থায় কাটাতে হয়েছিল জন্মস্থান খাটুয়ার স্কুলের একটি ঘরে! নিঃসঙ্গ একাকী অক্ষম হাসিরাশি মনের দিক থেকে দমে যাননি, তখনও চালিয়ে গেছেন ছবি আঁকা ও ছড়া লেখা। ১৯৯১-এ তাঁর লেখা শেষ ছড়া যেটি; সেটির উল্লেখ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। তিনি আমাদের জীবনের প্রেরণাস্বরূপ তিনি চিরকালীন। ১৯৯৩-র ৬ জুন তাঁর মৃত্যু ঘটে।

চাঁদের ভেতর চরকাকাটা বুড়ি
আজো হাঁটে দিয়েই হামাগুড়ি।
সেও কি আমার মতো থুড়থুড়িয়ে হাঁটে
আর বসে বসে কেবল চরকা কাটে।।

কৃতজ্ঞতা :
সংসদ বাংলা জীবনী অভিধান

বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ৮ মে হাওড়া জেলার মুন্সীরহাট অঞ্চলে বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী মঞ্চে সভাপতিত্ব করেন ব্রাহ্মণপাড়া চিন্তামণি ইনস্টিটিউশন্ (উচ্চ মাধ্যমিক)-এর প্রধান শিক্ষক চিন্ময় কুমার। প্রধান অতিথি ছিলেন সাঁকরাইল পরমানন্দ আশ্রমের মঠাধ্যক্ষ স্বামী পুরোষোত্তমানন্দ মহারাজ এবং প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায়। তিনি শিক্ষা, সংস্কার ও স্বাভিমান সম্পর্কে অভিভাবকদের সামনে বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানে শিশুরা কবিতা, ছড়া, নাচ, নৃত্যনাট্য ও নাটক মঞ্চস্থ করে।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শিবির

আগামী ৮ জুন থেকে ২২ জুন পর্যন্ত উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে, উদয়পুর বালিকা বিদ্যানিকেতনে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রথম বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষের প্রশিক্ষণ বর্গ হবে। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম দ্বিতীয় বর্ষের প্রশিক্ষণ বর্গ হতে চলেছে। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির পক্ষ থেকে তাই আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে যাদের প্রথম বর্ষের প্রশিক্ষণ হয়ে গেছে তারা অবশ্যই দ্বিতীয় বর্ষের প্রশিক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করুন। সম্পর্ক সূত্র—শ্রীমতী রেখা পাল, প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ-(০৩৩) ২৫৩০৮০৭৯,.

কবিতীর্থে রবিপ্রণাম

খিদিরপুরের হেমচন্দ্র পাঠাগারে হেম-মধু-রঙ্গ মঞ্চে গত ২৫ বৈশাখ সন্ধ্যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫১তম জন্মদিবস জাঁকজমকের সঙ্গে উদযাপন করল হেমচন্দ্র পাঠাগার। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক অসীম কুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। সঞ্চালক গ্রন্থাগারিক স্পন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদক মাধুরী দাসের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানে বর্ষা দের উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর সমবেত রবীন্দ্রসঙ্গীত করেন কবিতীর্থ কয়ার। একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন অনিরুদ্ধ সিংহ, মৌসুমী কর্মকার, মণিদীপা দাশগুপ্ত, সুমি রায়, অনুসূয়া মুখার্জী, শ্রীমতী অধিকারী, রাণু চন্দ্র, সুজিতা ব্যানার্জী। নৃত্যগীত আলেখ্য 'গানের লীলায় সেই কিনারে' পরিচালনা করেন সৌমেন চক্রবর্তী, পরিবেশনায় 'পূবালী'।

রবীন্দ্রনৃত্য আলেখ্য 'কত অজানার দিশারী তুমি' পরিকল্পনা গোঁরাচাঁদ সরকার। পরিচালনায় তোতা দে, মৌমিতা দাস ও রাহুল। পরিবেশনায় ক্যালকাটা মিউজিক এন্ড ডান্স থিয়েটার। আলেখ্য পাঠ মানস চট্টোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানে যন্ত্রসঙ্গীতে ছিলেন পলাশ দত্ত, ধনঞ্জয় মিশ্র, গণেশ মিত্র, পিঙ্কু ও উমেশ প্রসাদ। ছোট কিশোর-কিশোরী দ্বারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান দর্শকদের মনমুগ্ধ করে।

ছড়া সম্মেলন

৩০ এপ্রিল ২০১১ বিকাল ৫ টায় শ্রীরামপুর সুরাঙ্গন-অভিজ্ঞান ভবন, জগদবন্ধু মঞ্চে অভিজ্ঞান মেমোরিয়াল ছড়া আকাদেমীর তৃতীয় বার্ষিক ছড়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ডা: অমিত দত্ত, অধ্যাপক গিরিজা মুখার্জী, শিশু সাহিত্যিক ও কবি বিমল মৈত্র মঞ্চে অন্যতম সদস্য ছিলেন। উদ্‌বোধন সংগীত পরিবেশন করেন তাপস মুখোপাধ্যায়। অভিজ্ঞানের ছবিতে মাল্যদান করেন বিমল মৈত্র। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা ছিলেন ছড়াকার সুযশকান্তি দত্ত।

কোচবিহারে শিবযজ্ঞ মেলা এবং কুমারী পূজা

বিগত ৬৪ বছর ধরে কোচবিহারে শিবযজ্ঞ মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বৈশাখ মাসের শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে এবং বিশাল যজ্ঞের মাধ্যমে এই মেলা উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডঃ প্রদ্যোত কুমার গোস্বামী, হিমাদ্রি শঙ্কর ভট্টাচার্য, হরিপদ পাল, ধৃতিনাথ চক্রবর্তীসহ আরও বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিগণ।

সেইসঙ্গে গত ৯ মে সকালে কুমারী পূজার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে ১১ জন কুমারীকে দেবীরূপে পূজা করা হয়েছিল।

বাগনান কলেজে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

হাওড়া জেলার বাগনান কলেজে গত ৫ এপ্রিল থেকে দশদিন ব্যাপী মহা উৎসাহের সঙ্গে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির শুরু হলো। ৫২ জন ছাত্রছাত্রী শিবিরে অংশগ্রহণ করে। শিবিরের শিক্ষক রূপে পাঠদান করেন অলোক মণ্ডল। সমাপন কার্যক্রমে ছাত্র-ছাত্রীরা সংস্কৃত ভাষায় নাচ, গান ও নাটক প্রদর্শন করে সকলের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃত ভারতীর প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ। শিবিরের আয়োজক মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ প্রমুখ অধ্যাপিকা শুভ্রা ভট্টাচার্য।

বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ ও গবেষক

ডঃ প্রণব রায়কে সম্মান রাজ্যপালের

সংবাদদাতা॥ আঞ্চলিক ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, মন্দিরস্থাপত্য ভাস্কর্যের একনিষ্ঠ গবেষক অধ্যাপক ড. প্রণব রায় পুরাতত্ত্বে বিশেষত মন্দিরস্থাপত্য ভাস্কর্যে তাঁর সারাজীবন অসাধারণ গবেষণার জন্য গত ২ মে (২০১১) কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির ২২৮তম বার্ষিক অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল শ্রী এম. কে. নারায়ণন কর্তৃক পদক ও শংসাপত্র দ্বারা সম্বর্ধিত হলেন। অনুষ্ঠানে এশিয়াটিক সোসাইটি সভাপতি অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মিহির কুমার চক্রবর্তী স্বাগত ভাষণ দেন। ওইদিন সোসাইটির 'বিদ্যাসাগর হলে' পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী নারায়ণন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাবেশে সম্মানিত সুধী ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে বলেন, নূতন গবেষণা ও গ্রন্থ প্রণয়ণের দ্বারা এঁরা এশিয়াটিক সোসাইটির জ্ঞানচর্চার ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন। সোসাইটি এইসব পণ্ডিত জ্ঞানী ব্যক্তিদের সম্মান জ্ঞাপন করার জন্য তিনি আনন্দিত বলে জানান রাজ্যপাল।

রাজ্যপালের কাছ থেকে সম্মান গ্রহণ করছেন ডঃ রায়।

অধ্যাপক ড. রায় ভারতীয় পুরাতত্ত্বে তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণার জন্য ('significant contributions in Indian archaeology') 'এস. সি. চক্রবর্তী স্মারক পদক' ও শংসাপত্রের দ্বারা রাজ্যপাল কর্তৃক সম্মানিত হন। গত বৎসর মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে অধ্যাপক রায় সাম্মানিক ডি. লিট. উপাধিতে ভূষিত হন।

এশিয়াটিক সোসাইটির এই সমাবেশে উল্লেখযোগ্য পদকপ্রাপকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি গণেন্দ্রনারায়ণ রায়, অধ্যাপক উজ্জ্বল মজুমদার, অধ্যাপিকা সুভদ্রা মিত্র চান্না, অধ্যাপক ডি. এন. ঝা, অধ্যাপক ডি. এন. সানভাগ, ড. ওমনারায়ণ ভার্গব, ড. টি. এন. অনন্তকৃষ্ণন প্রমুখ।

উল্লেখ্য, সংস্কৃতচর্চা ও সংস্কৃতের অধ্যাপনায় সমর্পিত প্রাণ, কলকাতা সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃতের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ও বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের প্রাক্তন সচিব ড. প্রণব রায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক হয়েও দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে পুরাতত্ত্ব, মন্দিরস্থাপত্য-ভাস্কর্য এবং গ্রামবাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস অনুসন্ধান ও রচনায় একাদিক্রমে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। এক্ষেত্রে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর আদর্শ।

সংস্কৃত কলেজের তিনি ছিলেন কৃতী ছাত্র। ১৯৫৭ সালে বি. এ. সংস্কৃত অনার্স পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে তদানীন্তন রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর হাত থেকে রাজা রাধাকান্তদেব স্মৃতি স্বর্ণপদক লাভ করেন। প্রণববাবু ১৯৯৭ সালে অবসর গ্রহণ করলেও তাঁর গবেষণা ও অনুসন্ধান আজও থেমে নেই। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর গবেষণামূলক অজস্র রচনা প্রকাশিত হয়ে চলেছে। পশ্চিমবাংলা ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের পত্র-পত্রিকায় তাঁর এইসব রচনা প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিমবাংলার বিখ্যাত পত্রপত্রিকা, যেমন, আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ, অমৃত (অধুনা লুপ্ত), স্বস্তিকা, দ্যা স্টেট্‌সম্যান, ভূমিলক্ষ্মী (অধুনা লুপ্ত) প্রভৃতি জনপ্রিয় পত্রিকায় তাঁর মন্দিরস্থাপত্য, পুরাকীর্তি, টেরাকোটা, লোকসংস্কৃতি নিয়ে বহু রচনা প্রকাশিত হলেও দি ইলাস্ট্রেটেড্ উইকলি অফ ইন্ডিয়া, দি ইন্ডিয়া ম্যাগাজিন, ফ্রন্টলাইন, ক্যারভান, হিন্দুস্থান টাইমস্, দ্যা হেরিটেজ, দি ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ প্রভৃতি বহু ইংরাজি পত্রিকায় তাঁর অনেক সচিত্র প্রবন্ধও প্রকাশিত।

জনপ্রিয় এসব পত্রপত্রিকা ছাড়া গবেষণামূলক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অনেক প্রবন্ধে ড. রায় তাঁর প্রতিভার ছাপ রেখেছেন। এর মধ্যে জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বাংলা আকাদেমি পত্রিকা, বিশ্ববাণী, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা, আওয়ার হেরিটেজ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিরিশটির ওপর তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে আঞ্চলিক ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'মেদিনীপুরের ইতিহাস', ঘাটাল মহকুমার ইতিহাস 'ঘাটালের কথা' (১ম ও ২য় খণ্ড), মন্দিরস্থাপত্য ভাস্কর্য নিয়ে 'বাংলার মন্দির : স্থাপত্য ও ভাস্কর্য', পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্বদপ্তর প্রকাশিত 'মেদিনীপুর জেলার প্রত্নসম্পদ', তাঁর সম্পাদিত ও লিখিত গ্রন্থ 'মেদিনীপুর : ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন' (১ম-৩য় খণ্ড), ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিতব্য এবং নিজের লিখিত ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড (প্রকাশিতব্য) ছাড়া কাহিনীমূলক অনেক গ্রন্থ আছে। কাহিনীমূলক গ্রন্থের মধ্যে 'ইতিহাসের হারানো গল্প', 'জাতক-কথা' (১ম-৭ম খণ্ড), 'চুয়াড় বিদ্রোহ', 'পাইক বিদ্রোহ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত বৎসর জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তাঁকে যে রাজ্য আকাদেমি পুরস্কার' দেওয়া হয় সেখানে উপাচার্যের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '...রাজ্য আকাদেমি পুরস্কার গ্রহণের স্বীকৃতি জানিয়ে আমাদের সম্মানিত করেছেন...স্থাপত্যকলায় বাংলার মন্দিরস্থাপত্য গবেষক অধ্যাপক ড. প্রণব রায়।

আঞ্চলিক ইতিহাসের একজন নিষ্ঠাবান গবেষক ও পুরাতত্ত্বপ্রেমিক প্রণব রায় ছুটে গিয়েছেন অযোধ্যায় রামজন্মভূমি ও বাবরি মসজিদের উৎখনন পর্যবেক্ষণ করতে।...প্রণব রায়ের গবেষণাকাজের স্বীকৃতি জানিয়ে লন্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি গত বছর তাঁকে এফ. আর. এ. এস....নির্বাচিত করেছেন। এর আগে ২০০১ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটিও তাঁকে এফ. এ. এস. (ফেলো অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি) নির্বাচিত করেছিলেন।...ইংরাজি ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় অনর্গল বক্তৃতায় দক্ষ ড. প্রণব রায় এখনও নিরলস গবেষণায় রত। কৈশোর থেকে অজস্র সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথি ও পুরাবস্তু সংগ্রহ করে তিনি পশ্চিম

বাড়ির স্টাডিরুমে 'ডি লিট' হাতে ডঃ রায়।

মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার বাসুদেবপুরে তাঁর জন্মস্থানে পিতৃদেব পরিব্রাজক পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থের নামাঙ্কিত একটি সংগ্রহশালাও প্রতিষ্ঠা করেছেন।

নির্বাচনী ফলাফল : ঈশান কোণে কালো মেঘ

শিবাজী গুপ্ত

বিস্‌মিল্লা-হির রাহমান রহিম। আল্লা পাকের দোয়ায় জুম্মাবারে জুম্মার নামাজ ঘোরে দুপুর ১টা ১ মিনিটে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা-নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা খোদার নামে (মনে মনে) কসম খেয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। তা করুক, আল্লাতালা বরকত দিক, জামা জুতা, লাঠি সোঁটা, ছাতামাথা সব সোজা হোক। আরে আল্লার-কুদরতে কি না হতে পারে! তিনি রাজাকে ফকির করেন; ফকিরকে রাজা করেন। তাই তো রসিক নাট্যকার-কবি তো কবেই গেয়ে রেখেছেন :

কত কেরামত জানরে বান্দা
কত কেরামত জানো,
মাঝ দরিয়ায় ফেলে জাল
ডেঙ্গায় বসে টানো।
আরে চালে ঝোলে চালকুমড়ো
গাছে ধরে বেল,
কদু কুমড়ো থাকতে রে আল্লা
সর্ষির মধ্যি তেল।

তা খোদার কেরামতি-ই বটে! ২০০৬-এর ৪৩টি মুসলিম সদস্য সংখ্যা এক লাফে প্রায় ৬০টিতে পৌঁছেছে। অর্থাৎ ১৭টি আসন হিন্দুদের হাতছাড়া হয়েছে। আর প্রথম নির্বাচনের কথা ধরলে (১৯৫২) দেখা যায় ৫টি মুসলিম আসন বেড়ে ৬০টি আসন হয়েছে। অর্থাৎ ১২ গুণ বেড়েছে। মুসলমান সমাজে জন্মবৃদ্ধির হারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আল্লার দোয়ায় আর দুটি নির্বাচনেই মুসলিম সদস্য সংখ্যা সেঞ্চুরিতে পৌঁছে যাবে নিঃসন্দেহ। তখন তেরঙা, ঘাসফুল, কাস্তে-হাতুড়ির আড়ালে লুকিয়ে থাকা মুসলিম সদস্যরা সব দল ছেড়ে বেরিয়ে এসে চাঁদ তারা মার্কা সবুজ পতাকার নিচে সামিল হয়ে পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতার দখল দাবী করবে। মুর্শিদাবাদ থেকে সে অভিযান ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ক্রমে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই তার শাখাপ্রশাখা ছড়াবে। মুর্শিদাবাদ জেলার কথাই ধরা যাক। ২০০১ সালের নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে ২০টি আসনের মধ্যে ১১টি আসনে মুসলমান সদস্য নির্বাচিত হয়। হিন্দু সদস্য সংখ্যা ছিল ৯ জন। এবারে ওই জেলার ২২টি আসনে থেকে মাত্র ৩ জন হিন্দু সদস্য নির্বাচিত হয় --- বাকী ১৫টি আসনই মুসলমানরা দখল করে। মালদহ জেলাতেও ১২টি আসনের মধ্যে ৬টি আসনই মুসলমানদের দখলে যায়। সমস্ত ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে—একমাত্র দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা ছাড়া সব জেলাতেই বিধানসভায় মুসলমান সদস্য নির্বাচিত হয়েছে—এমন কি যেসব জেলা থেকে কখনও কোনও মুসলমান সদস্য নির্বাচিত হতে পারত না—যেসব জেলা থেকে মুসলমান সদস্য বিভিন্ন দলের প্রতীক পতাকার আড়ালে থেকে নির্বাচিত হয়ে গেছে।

কিন্তু এই পতাকা প্রতীকের আড়াল কয়দিন বজায় থাকবে? আর মাত্র ১২ বছর—২০১১'এর নির্বাচন পর্যন্ত, তারপর আর মুসলমান ভোটাররা অন্যদলের পতাকা প্রতীকের বোরখায় মুখ ঢাকবে না। সব দলের মুসলমান একদল হয়ে তাদের জাতীয় পতাকা ও প্রতীক পত্‌পত্‌ করে উড়িয়ে কেল্লাফতে করার জলুসে মাতবে। এখন তো প্রতিটি জেলায় চারপাঁচটা করে আসন দখল করে অস্তিত্ব জাহির করার চেষ্টায় আছে। তারপর যখন যথাসম্ভব জনবল অর্থাৎ মুসলিম ভোটার দলবদ্ধ করতে পারবে—তখন সবকটি সেকুলার দলের মুখে ঝাঁটা মেরে নারায়ে তকবির-আল্লা-হু-আকবর ধ্বনির তুলে, কোমরে ছোরা গুঁজে মাঠে ময়দানে নেমে পড়বে। তখন বাছাধনদের পালাবার জন্য ইঁদুরের গর্ত খোঁজা শুরু করতে হবে। কেরল ও অসমে ইতিমধ্যেই সে খেলা শুরু হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস ৪২টি আসনে মুসলমান প্রার্থী দিয়ে পেয়েছে ২৬টি আসন। কংগ্রেস ২২টি আসনে মুসলমান প্রার্থী দিয়ে পেয়েছে ১৫টি আসন। আর বামফ্রন্ট ৫৬টি আসনে মুসলমান প্রার্থী দিয়ে পেয়েছে ১৬টি আসন। মুসলমান রাজনীতিকরা আর বেশিদিন নির্বাচনে তে-ভাগা নীতি মানবে না। তারা এই তিন দলে ভাগ হয়ে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করবে না। এই ত্রিধা-বিভক্ত মুসলমান সদস্যরা সব এক হয়ে অতীতের Muslims Vs. Others অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম রাজনীতিতে ফিরে যাবে।

মুসলমানরা তাদের আসন সংখ্যা ঠিকই রেখেছে—তারা বামফ্রন্টের ৫৬টি থেকে আরও ৪টি বেশি অর্থাৎ ৬০টি আসন দখলে রেখেছে। আবার তৃণমূল ও কংগ্রেসের দেওয়া ৬২টির চেয়ে দুটি কম পেয়ে ৬০টি আসনই দখল করেছে। যে দ্রুতহারে মুসলমান ভোটার সংখ্যা বাড়ছে তাতে আগামী ১০ বছরে মুসলমানরা ১০০ আসনে আলাদা প্রার্থী দিয়ে ১০০টি আসনই জিতে নিলে অবাক হবার কিছু নেই। সেই অশুভ দিনকে ঠেকাতে পারে যদি হিন্দু ভোটাররা কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস- সিপিএম- সিপিআই- আরএসপি- ফরোয়ার্ড ব্লক-এস ইউ সি-বিজেপি ইত্যাদি দলের মধ্যে নিজেদের ভোট ভাগ হতে না দিয়ে শুধু হিন্দু পরিচয়দানকারীকে দলবদ্ধ হয়ে ভোট দেন। দলের কোন্দলে শক্তিক্ষয় না করে হিন্দুত্বের হিন্দোলে আন্দোলিত হলেই শেষ রক্ষা। হিন্দুদের ঘাড় থেকে সেকুলারিজম্ ভূত তাড়াতে না পারলে পশ্চিমবঙ্গের ইসলামীকরণের হাত থেকে বাঁচার আর কোনও পথ নেই। সবাইকে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর মতো নামাজ-রোজা, দোয়া-দরুদ, ইফ্‌তার-মোনাজাত, সেলাম আলাইকুমের শিক্ষা নিতে হবে।

২০০৬-এর ৪৩টি মুসলিম সদস্য সংখ্যা এক লাফে প্রায় ৬০টিতে পৌঁছেছে। অর্থাৎ ১৭টি আসন হিন্দুদের হাতছাড়া হয়েছে। আর প্রথম নির্বাচনের কথা ধরলে (১৯৫২) দেখা যায় ৫টি মুসলিম আসন বেড়ে ৬০টি আসন হয়েছে। অর্থাৎ ১২ গুণ বেড়েছে। মুসলমান সমাজে জন্মবৃদ্ধির হারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আল্লার দোয়ায় আর দুটি নির্বাচনেই মুসলিম সদস্য সংখ্যা সেঞ্চুরিতে পৌঁছে যাবে নিঃসন্দেহ। তখন তেরঙা, ঘাসফুল, কাস্তে-হাতুড়ির আড়ালে লুকিয়ে থাকা মুসলিম সদস্যরা সব দল ছেড়ে বেরিয়ে এসে চাঁদ তারা মার্কা সবুজ পতাকার নিচে সামিল হয়ে পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতার দখল দাবী করবে।

গীতুই অনুপ্রেরণা ভারতীয় নারীদের

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাচ্চেন্দ্রী পাল ১৯৮৫ সালে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে বিশ্বের শীর্ষবিন্দু ছুঁয়েছিলেন। তারপর আরও একবার তিনি মাউন্ট এভারেস্টে উঠেছিলেন। পরবর্তীকালে সন্তোষ যাদবও অনুরূপ কৃতিত্বের অধিকারিণী হয়েছিলেন। অন্য সব দেশের মহিলাদের মতো এদেশের মহিলারাও যে পারিপার্শ্বিক সুযোগ-সুবিধে ও অনুপ্রেরণা পেয়ে অতি জাগতিক কীর্তি স্থাপন করতে পারেন এই দুই নারীই তার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। ক্রীড়াজগতের নানা ক্ষেত্রে ভারতীয় মহিলারা আপন শৈলী ও মাধুর্যে জগৎবাসীকে চমৎকৃত করেছেন, জীবনে-জীবন যোগ ঘটিয়ে দেশ-কাল-সীমানা অতিক্রম করে জীবনের চেয়েও বৃহৎ সত্ত্বা হিসেবে প্রতিবিম্বিত করেছেন। সেই তালিকায় নবতম সংযোজন গীতু অ্যান জোন্স। কেরল কন্যা গীতু আজ বিশ্বের জনপ্রিয়তম ও সবচেয়ে আলোচিত আমেরিকান বাস্কেটবল লিগ বা এন বি এ-তে খেলার সুযোগ পেতে চলেছেন।

ভারতে বাস্কেটবলের মান উন্নয়নের জন্য আমেরিকা থেকে এসেছেন ট্রয় জাস্টিস। তিনি এ দেশের বাস্কেট বল অপারেশন ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছেন। আর ভারতে এসেই তার চোখ পড়ে যায় গীতুর দিকে। তার মনে হয়েছে এই সেই মেয়ে যে এন বি এ-তে খেলার সবদিক থেকে উপযুক্ত। আর কোনও ভারতীয় যদি একবার এন বি এ-তে খেলার সুযোগ পায় তাহলে তার কৃতিত্ব ও গৌরবচ্ছটায় গোটা ভারতবর্ষের বাস্কেট বল খেলার ক্ষেত্রে বিরাট বিপ্লব ঘটে যাবে। প্রচুর ছেলে-মেয়ে খেলাটির প্রতি আগ্রহী হবে। আসবে স্পনসরের বন্যা, মিডিয়ার প্রচার, সরকারি সুযোগ-সুবিধা। তাই কালবিলম্ব না করে ট্রয় গীতুকে আমেরিকায় ট্রায়াল দিতে পাঠিয়ে দেন তিনটি বড় দলের জন্য।

দিনকয়েক আগে গীতু ট্রায়াল দিয়ে এলেন শিকাগো স্কাই, লস অ্যাঞ্জেলস স্পার্কস ও সান অ্যান্টোনিও সিলভার স্টারস-এ। ট্রায়াল দিয়ে এসে বেশ আত্মবিশ্বাসী গীতু। রয়েছেন সুযোগের অপেক্ষায়। ভারতীয় বাস্কেটবলের কর্তাদের গীতু জানিয়েছেন তার খেলা ও আচার আচরণে খুশি হয়েছেন তিন দলের কর্তারাই। এবছরই তারও এদেশের বাস্কেটবলের এক যুগান্তকারী দিকচিহ্ন তৈরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যদি এর কোনও একটা দল গীতুকে নিজেদের নিয়মিত খেলোয়াড় হিসেবে মনোনীত করে। গীতুর হাইট, আধুনিক টেকনিক, পরিশ্রম করার ক্ষমতা সর্বোপরি খেলাটির প্রতি নিষ্ঠা ও নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার ঐকান্তিক সংকল্প আমেরিকান কর্তাদের খুব ভালো লেগেছে। স্পার্কসে দুদিনের ট্রায়ালের পর তিনি শিকাগো স্কাইয়ে ট্রায়াল দিয়েছেন। সেখান থেকে উড়ে যান টেক্সাসে। তার ধারণা তিনটি দলের কর্তারাই তাকে মনে মনে পছন্দ করে ফেলেছেন, আর এবছরই তিনি নেমে পড়বেন এন বি এ কোর্টে।

গীতুর বাস্কেটবল শুধু ভারতেই আটকে থাকেনি। ২০০৬ থেকে তিনি টানা তিন বছর খেলে এসেছেন অস্ট্রেলিয়ার লিগেও। সেখানে গীতু খেলেছেন রিংউড হকস দলের হয়ে। পরে লিয়েন নিয়ে খেলেছেন রেঞ্জার্সেও। দুটি দলই সেদেশের শীর্ষস্থানীয় দল। ২০০৬-এর মেলবোর্ন কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় দলের টপ স্কোয়ার ছিলেন গীতু। কমনওয়েলথ গেমসেই তার খেলা চোখ টেনে নেয় রিংউড ক্লাবের কোচ টিম মার্টিনের। তার সুপারিশেই ক্লাব কর্তারা গীতুকে সরাসরি দলভুক্ত করেন। অস্ট্রেলিয়াতে তার খেলার সুযোগ পাওয়াটাই জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। যে দেশের বাস্কেটবল মান আমেরিকার মতো না হলেও ভারতের থেকে অনেক উন্নত। কঠিন লড়াই ও আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রশিক্ষণ তাকে আন্তর্জাতিক মানের 'সাসার' ও 'গ্রাবলাবে' পরিণত করে, যা তার আজকের এন বি এ-তে ট্রায়ালে জায়গা করে নেওয়ার 'স্টেপিং-স্টোন'।

আমেরিকা থেকে ফিরে গীতু সাংবাদিকদের বলেছেন তার অভিজ্ঞতার কথা। 'আমেরিকায় সুযোগ পেতে গেলে অনেক আগ্রাসন দরকার। ওখানে গিয়ে প্র্যাকটিসে দেখলাম অনেক খেলোয়াড় একসঙ্গে স্কোর করার চেষ্টা করছে। সেদেশে খেলোয়াড়দের শুধু ক্রীড়াগত দক্ষতার ওপরই জোর দেওয়া হয় না, একইসঙ্গে লক্ষ্য রাখা হয় তার বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা-চেতনার সার্বিক পরিমার্জনের দিকেও। সব মিলিয়ে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে ওঠার জন্য যা যা করণীয় সব করা হয়, যার ভরকেন্দ্র অবশ্যই খেলার মাঠ। এই মুহূর্তে মেয়েদের এন বি এ-তে কুড়িজন বিদেশী খেলোয়াড় রয়েছে বিশ্বের ১৩টি দেশের। গোটা বিশ্বে প্রসার বাড়াতে সংখ্যাটা আরও বাড়বে আগামীদিনে। সিলভার স্টারসের চিফ কোচ জন হাজেস বলেছেন 'আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে গীতু ভাল পারফরমেন্স করেছে ট্রায়ালে। ও যদি শেষপর্যন্ত আমেরিকায় সুযোগ পায় তাহলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ থেকে মেয়েরা দলে দলে ছুটে আসবে এন বি এ-তে খেলার জন্য।

শব্দরূপ-৫৮৪ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

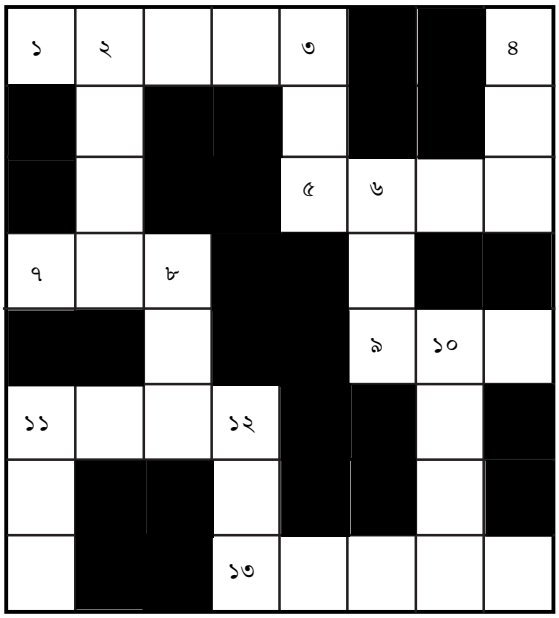

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. প্রাচীন মগধের অর্থাৎ দক্ষিণ বিহারের রাজধানী, আধুনিক পাটনা নগর, **৫.** প্রকৃতির ধর্মবিশেষ, ইচ্ছা দ্বেষ অহংকার প্রকৃতির কারণ, **৭.** স্ত্রীজাতীয় প্রেতযোনী, পিশাচী, **৯.** মাদারফল, শেষ দুয়ে স্তন, **১১.** যে তিথিতে লক্ষ্মী বলেন আজি নারিকেলের জল পান করিয়া কে জাগিয়া আছ, এস তাকে সম্পত্তি দান করিব, **১৩.** শ্রাবণ হতে পৌষ পর্যন্ত বৎসরার্ধ, যখন সূর্য দক্ষিণদিকে গমন করে।

উপর-নীচ ঃ ২. ট্যাঁকশালের অধ্যক্ষ, শেষদুয়ে স্বামী, **৩.** তন্তুবায়ের তুরী, মাকু, **৪.** রামায়ণে বানরদের মধ্যে চিকিৎসক, **৬.** বলদের কাঁধে যে কাষ্ঠ থাকে, **৮.** রোগহীন, সুস্থ, **১০.** নীলোৎপল, যুবনাশ্বের পৌত্র, **১১.** কোদালি, ''ষড়রিপু হৈল—স্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ'' **১২.** খোরাক, খাবার।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৮২

■	খা	গু	ব	■	মা	রী	চ
■	প্পা	■	র্ব্ব	■	গ	■	ম্প
দী	■	■	র	দ	ন	■	ক
ন	চি	কে	তা	■	■	■	ন
ব	■	■	■	দা	য়	ভা	গ
ন্ধু	■	অ	ঙ্গ	দ	■	■	র
মি	■	ক্রূ	■	খা	■	ঊ	■
ত্র	স	র	■	নি	ক	ষা	■

সঠিক উত্তরদাতা

অনিরুদ্ধ বাগচী
আসানসোল, বর্ধমান
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৮৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ২০ জুন, ২০১১ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা।। সর্প যজ্ঞ।। ৭

Swastika RNI No. 5257/57
6 June - 2011
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

গর্জে উঠুক বিপুল জনতা

কেউ কেউ বলছে যে এবার — 'এক জাতি এক প্রাণ' কেন হবে না? কেন হবে না Common Civil Code? কেন হবে না সকল ভারতবাসীর জন্য এক আইন? স্বাধীনতার ৬৪ বছর পরেও যদি না হয় তাহলে যে মহাবিপদ সামনে এগিয়ে আসছে, আমরা তার থেকে মুক্ত হব কিভাবে? এই সমস্যার কথা — এবার বিপুল জনতার সামনে, প্রচারের মাধ্যমে, বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা তুলে ধরব, ক্রমাগত — বছরের পর বছর। জনতা বিচার করবে, কী করা যায়। কেমন করে আন্দোলন করা যায়। এভাবেই একদিন ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে উঠবে জনতার মাঝখান থেকে। অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চাই (Common Civil Code চাই), সংখ্যালঘু তকমার বিলুপ্তি চাই। সমস্ত ভারতবাসীর জন্য এক আইন চাই। এ লড়াই বিপুল জনতার। এই উদ্দেশ্য নিয়ে Forum of Nationalist Thinkers, প্রচারের কাজ শুরু করেছে। সকলের যোগদান আহ্বান করছে। সকলের সবরকম সাহায্য প্রার্থনা করছে। এ লড়াই আমাদের সকলের। হিন্দুস্থান অমর রহে। বন্দেমাতরম্।।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচন
প্রধান নির্দেশিকা (ইস্যু) মাত্র দু'টি

এক - শাসকের সর্বস্তরে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি।

দুই - অভিন্ন দেওয়ানী বিধি (Common Civil Code)

-- Courtesy --

Issued in Public Interest by

FORUM OF NATIONALIST THINKERS

12, Waterloo Street, 2nd Floor, Kolkata - 700 069

Mob. : 9051498919 / 9433047202